ফেব্রুয়ারি ২০২১ ❑ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৭

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

একুশের গল্প

বিদ্যাসাগর

বাংলা ভাষা ও বর্ণমালা

শুচী ইসলাম, ৮ম শ্রেণি, মহেশপুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহেশপুর, ঝিনাইদহ

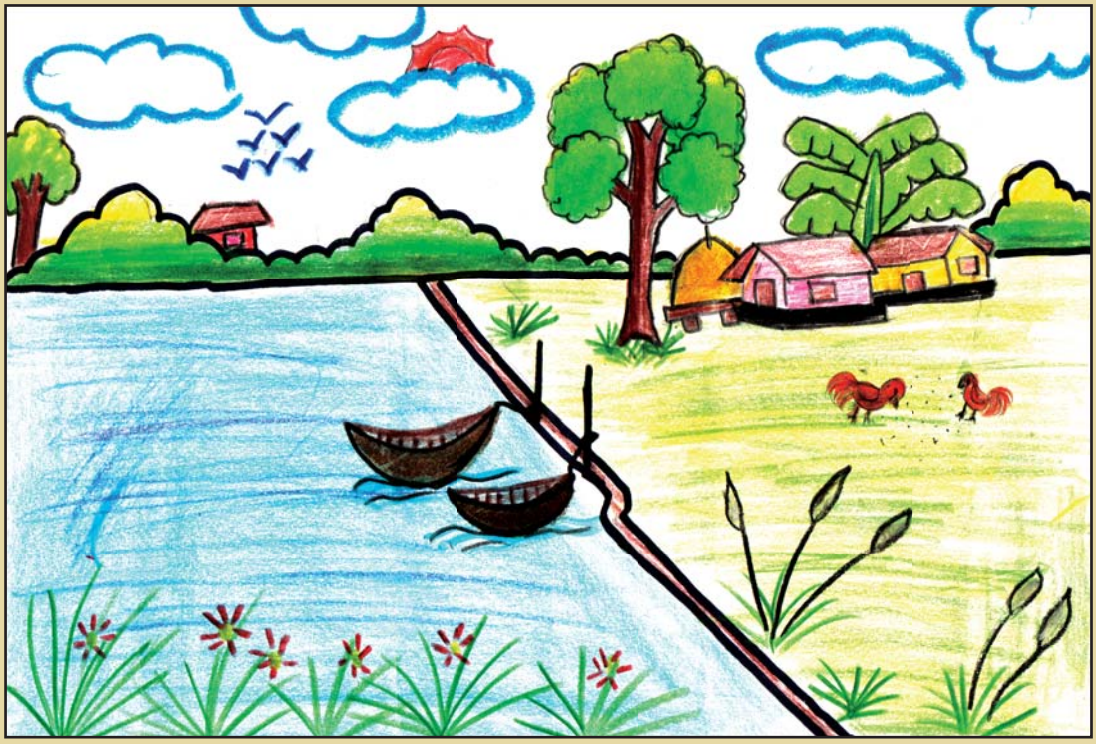

আব্দুল্লাহ আল নাফিস, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

অ্যাডহক প্রকাশনা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

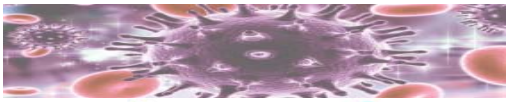

করোনার বিস্তার প্রতিরোধে

নো মাস্ক নো সার্ভিস

মাস্ক নাই তো সেবাও নাই

মাস্ক ছাড়া সরকারি-বেসরকারি
প্রতিষ্ঠানে কোনো সেবা মিলবে না

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-45, No-8, February 2021, Tk-20.00

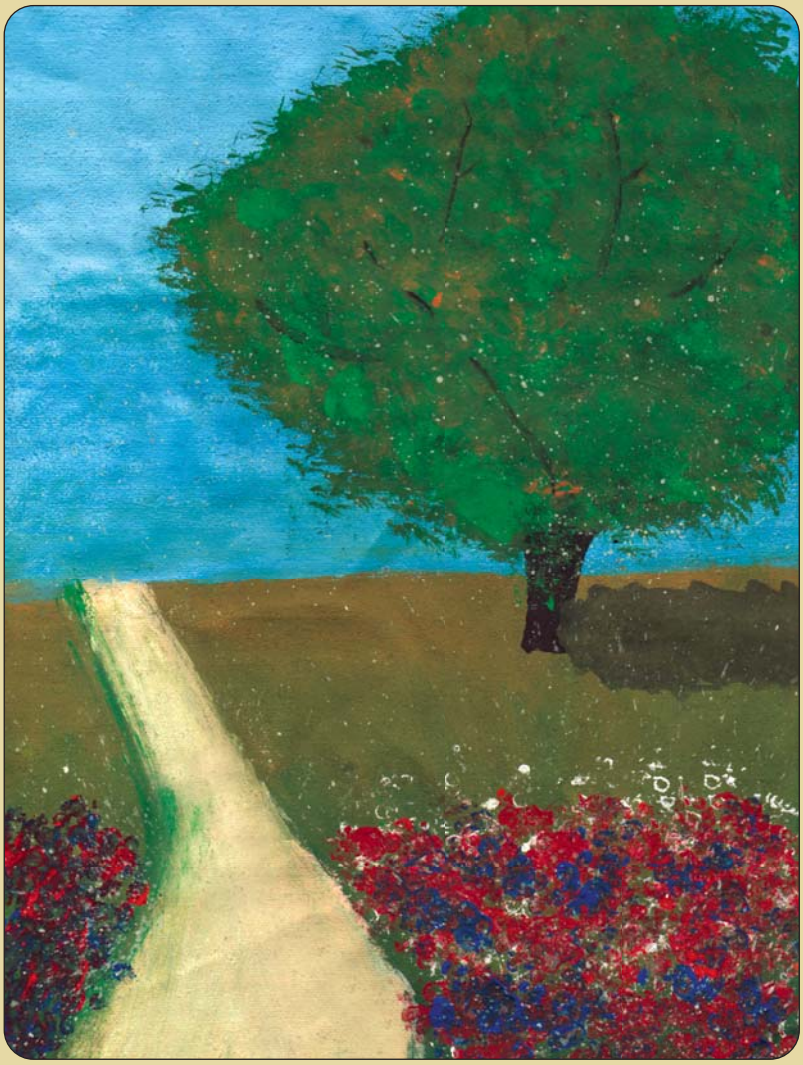

সুস্নিগ্ধ আদনান হিয়া, ৭ম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্যভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

অমর ২১শে

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

ফেব্রুয়ারি ২০২১ ❑ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৭

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মো. হুমায়ুন কবীর

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
মো. মাছুদ আলম

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সৌজন্য সংখ্যা

সম্পাদকীয়

কেমন আছো ছোট্ট বন্ধুরা? আশা করি ভালো আছো। তোমরা তো জানো ফেব্রুয়ারি মাস ভাষা আন্দোলনের মাস। এই মাসেই আমাদের মাতৃভাষা বাংলার ওপর আঘাত করেছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। বাহান্নতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি শুধুমাত্র বাংলার মানুষের মুখে মুখেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ক্রমান্বয়ে পূর্ব বাংলার সব শহরে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতেই ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ অসংখ্য ভাষা শহিদ। এজন্য এ মাস এলেই আমরা গেয়ে উঠি 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'। প্রতিবছর এদিন আমরা শহিদমিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাই তাঁদের।

১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। দিনটি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়।

ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখ জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস। আমরা চাই প্রত্যেকের ঘরে-স্কুলে-পাড়া-মহল্লায় বেশি বেশি গ্রন্থাগার গড়ে উঠুক। তবেই আমরা আলোকিত মানুষ হতে পারব। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন স্বার্থক হবে।

ভালো থেকো বন্ধুরা। তোমাদের সকলের জন্য রইল শুভকামনা। ■

সূচি

নিবন্ধ

০৩ একুশে ফেব্রুয়ারি/জাফরুল আহসান
১৩ একুশের যা কিছু প্রথম/শরীফ উদদীন
১৮ ইশারা ভাষা/মনজুর হোসেন
১৯ বিদ্যাসাগর: বাংলা ভাষা ও বর্ণমালা
মো. সিরাজুল ইসলাম
২৩ ভাষা সংগ্রামী শেখ মুজিবুর রহমান এবং লোকায়ত ইতিহাস/সাইমন জাকারিয়া
৪৪ সেবা যাদের ব্রত/শেখ শামসুল হক
৪৭ জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস/শাহানা আফরোজ
৪৮ ব্যতিক্রমী মাস/মেজবাউল হক
৫৩ বাংলাদেশের উপহার/সালেহ সালেহীন
৫৫ ফসলের মাঠে বঙ্গবন্ধু/মো. জামাল উদ্দিন
৫৬ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ম্যারাথন-২০২১
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৫৭ দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৫৯ টেনিসে চ্যাম্পিয়ন সুস্মিতা/জান্নাতে রোজী
৬২ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ
৬৪ বুদ্ধিতে ধার দাও জানুয়ারি ২০২১ -এর সমাধান

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবিতা

২৬ মিনহাজুল ইসলাম/মো. গোলাম রাব্বানী

ভাষা দাদু

৩১ বাক্যের বর্গ/তারিক মনজুর

রম্য গল্প

৩৪ কেল্টু মামা/সাইফুল ইসলাম জুয়েল

গল্প

০৬ একুশের গল্প/সেলিনা হোসেন
২৭ আমার তোমার শেকড়/নাসীমুল বারী
৩৮ রুকু টুকুর গাছ বন্ধু/অদ্বৈত মারুত
৫১ ছোটো থেকেই শিখতে হবে/রকিবুল ইসলাম

কবিতাগুচ্ছ

৪১ আবেদীন জনী/হামীম রায়হান
৪২ মোহাম্মদ আজহারুল হক/দেলওয়ার বিন রশিদ
সুষমা ফাল্গুনী/ইরিনা হক
৪৩ শেখ সালাহউদ্দীন/নিজামউদ্দীন মুন্সী

ছোটোদের লেখা

৪৯ ভাষা নিয়ে যুদ্ধ/শেহ্‌জাদী ফারহা অর্থি

ছোটোদের ছড়া

৫০ নওশিনা ইসলাম/সুহিন হোসেন

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : শুচী ইসলাম/আব্দুল্লাহ আল নাফিস
শেষ প্রচ্ছদ : সুস্নিগ্ধ আদনান হিয়া
১০ তাসনীম বিনতে সিদ্দিক
৩০ মাইশা বিনতে মাহমুদ
৩৩ ফাতিমা জারা
৫২ রামিসা নিগার রুমা
৬০ শান্তমা খানম নিথী/নাজিলা মাহফুজ নাবিহা
৬১ সাদমান রহমান/সোনালী দাস

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

একুশে ফেব্রুয়ারি

জাফরুল আহসান

জন্মের পর মায়ের মুখ থেকে আর নিকটজনের কাছ থেকে শুনে মানুষ প্রথমে যে ভাষায় কথা বলে তাকেই আমরা মাতৃভাষা বলি। দুর্ভাগ্য আমাদের; আমাদের মাতৃভাষা রক্ত দিয়ে কিনতে হয়েছে। ছাত্র- জনতার আত্মত্যাগে রক্তাক্ত হয়েছিল রাজপথ।

আমাদের মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষার শেকড় বাকলের বিস্তৃত ইতিহাস জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে বেশ খানিকটা পেছনের দিকে, ভাষা আন্দোলনের কাছে; ফিরে যেতে হবে ২১শে ফেব্রুয়ারির কাছে।

কেমন ছিল ভাষা আন্দোলনের সে দিনগুলো? কেনই বা ২১শে ফেব্রুয়ারি? কী হয়েছিল সেদিন?

৬৯ বছর আগের কথা।

নদীবিধৌত শ্যামল প্রকৃতির অবারিত হাতছানি, পাখ-পাখালির কলকাকলি মুখরিত, সবুজ চাদরে মোড়া দেশটি তখন অবিভক্ত পাকিস্তান নামে পরিচিত। নানা বর্ণের, নানা ধর্মের, নানান ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর বাস ছিল এ পাকিস্তানে। আমাদের আজকের বাংলাদেশটি ছিল তথাকথিত পাকিস্তানের অংশ বিশেষ, যার নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান।

তদানীন্তন পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী। পাশাপাশি ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৪.৬ শতাংশ বাঙালি, ২৮.৪ শতাংশ পাঞ্জাবি, ৭.২ শতাংশ উর্দুভাষী, ৫.৮ শতাংশ সিন্ধি ভাষাভাষী, ৭.১ শতাংশ ভাষাভাষী সেই সাথে ১.৮ শতাংশ ছিল ইংরেজি ভাষাভাষী। বন্ধুরা, এখানে ১০৪.৯ শতাংশ দেখানো হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা যায় – অনেকেই নিজেকে দোভাষী বলে জানিয়েছিলেন।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসক সম্প্রদায় তথাকথিত পূর্ব পাকিস্তানে [আজকের বাংলাদেশ] বসবাসরত ৫৪.৬ শতাংশ জনগোষ্ঠী বাঙালির মুখের ভাষা বাংলাকে অস্বীকার করে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার পায়তারা চালায়। মেতে ওঠে গভীর ষড়যন্ত্রে।

লড়াকু বাঙালি মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে গর্জে ওঠে। ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত পাকিস্তানের গণপরিষদ সদস্য জনাব ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন। শাসকচক্র এর সুদূরপ্রসারি পরিণাম বুঝতে পেরে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদে তড়িঘড়ি করে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' নামে প্রস্তাবটি পাস করিয়ে নেওয়া হয়। উপেক্ষিত হয় বাংলার প্রাণের দাবি।

শাসকচক্রের ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাষার দাবিতে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা উপলব্ধি করে মাতৃভাষা তাদের অহংকার। ভাষার দাবিতে কোনো আপোশ নয়। এ প্রসঙ্গে ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন বলেন–

'আমি আগের বছর বি.এ পাস করেছি, সনদ গ্রহণের জন্য কার্জন হলে সমাবর্তন সভায় যাই, যথারীতি সমাবর্তন শুরু হলো; জিন্নাহ প্রধান অতিথির ভাষণের এক পর্যায়ে তার রেসকোর্স ময়দানের বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করে বললেন- 'উর্দু, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললাম–

'নো নো।' সভায় সনদ গ্রহণের জন্য আগত অন্যান্য সদস্য আমার মতো একই ধ্বনি তুললেন– 'নো নো'। জিন্নাহ বিমর্ষ হয়ে গেলেন। ভাষা সম্পর্কে তিনি আর বক্তব্য বাড়ালেন না। [একুশের পটভূমি একুশের স্মৃতি/ সম্পাদক মতিউর রহমান/পার্ল পাবলিকেশন/প্রথম আলো/একুশের বইমেলা/পৃষ্ঠা ২০০৩ ,৭৩ এবং ৭৪]

শাসক চক্রের রক্তচক্ষু ভয়ভীতির পাশাপাশি জেল জুলুম এড়িয়ে বাঙালি সংঘবদ্ধ হয়ে গড়ে তোলে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি '। ভাষার দাবিতে ছাত্রসমাজের আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি বুঝতে পারে ভাষার দাবিই বাঙালির প্রাণের দাবি।

শাসক চক্রের ভিত নড়ে ওঠে। আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য শাসক নানারকম কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। নিষিদ্ধ করা হয় সব ধরনের সভা সমাবেশ। হুলিয়া, হামলা, মামলা আর গ্রেফতারের মাধ্যমে আন্দোলন দমাবার ব্যর্থ চেষ্টা চালায় সরকার। পাকিস্তানি শাসক চক্র আর শোষিত বাঙালি জনগোষ্ঠী মুখোমুখি হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল। মিটিং, মিছিল, পথসভায় রাজপথ মুখরিত। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সরকারের জারী করা ১৪৪ ধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর ছাত্র-জনতা। সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রের মতানুসারে; বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে গাজিউল হকের নেতৃত্বে সকাল এগারোটায় দশজনের একটি দল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া মাত্র পুলিশ বাধা দেয়। শুরু হয় পুলিশ জনতা ধাওয়া-পালটা ধাওয়া। শাসক শ্রেণির প্রতি বাংলার জনগণের ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বৃষ্টির মতো নিক্ষিপ্ত হয় ইট পাটকেল; সেই সাথে পুলিশের নিক্ষিপ্ত টিয়ার গ্যাস আর রাবার বুলেটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশ এক রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

সময় গড়িয়ে যায়, ছাত্র জনতার প্রতিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। জনজোয়ার রুখবার সাধ্য কার? বিকাল ৩.১০ মিনিটে পূর্ব পাকিস্তানের জেলা প্রশাসক এ. এইচ. কোরাইশি সিএসপি'র নির্দেশে একদল শসস্ত্র পুলিশ দু'দফায় ২৭ রাউন্ড গুলি চালায়। [একুশের দলিল/এম আর আখতার মুকুল/ সাগর পাবলিশার্স/পৃষ্ঠা ৫১ এবং ৬৩।] কালো রাজপথ ছাত্র- জনতার রক্তে লাল হয়ে ওঠে। ঘাতক বুলেট কেড়ে নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এম.এ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবুল বরকত, মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের বাণিজ্য

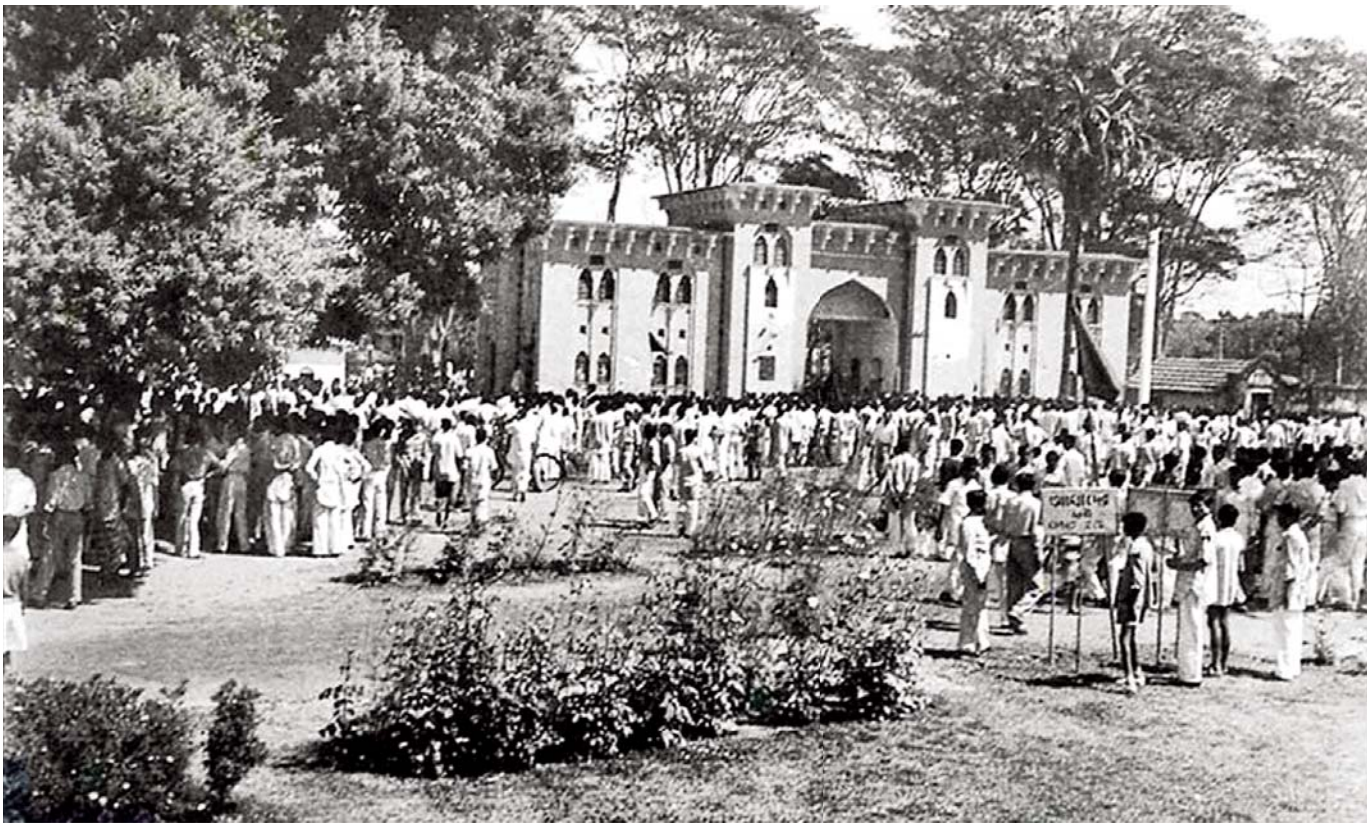

ভাষা আন্দোলনের একটি মুহূর্ত

বিভাগের ছাত্র রফিকউদ্দিন আহমেদ, ময়মনসিংহ নিবাসী আব্দুল জব্বার , তখনকার শিল্প ডাইরেক্টরেটে কর্মরত আব্দুস সালামসহ আরো অনেকের।

অর্থাৎ বাঙালির মুখের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে লড়তে হয়েছে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মিলে ১৯৫৬ সালে।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণীত হলে সংবিধানের ২১৪ (১) অধ্যায়ে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে লেখা হয়– 'The state Language of Pakistan shall be Urdu And Bangali'।

বুলেট, বেয়োনেট, নির্যাতন আর শাসকের রক্তচক্ষু অবজ্ঞা করে যেসব অকুতোভয় ভাষা সৈনিক আত্মাহুতি দিয়েছেন; বাঙালি জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের তথা সকল শহিদের আত্মদানের মহিমা এবং বাঙালির শৌর্য ও বীরত্ব হৃদয়ে লালন করবে, মনে রাখবে পরম শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায়।

বাঙালি জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে কানাডার ড্যাংকুভারে বসবাসরত বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম ও তাঁর বন্ধু সালামের কথা। মহান ভাষা আন্দোলনের ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথা মাথায় রেখে মাতৃভাষাকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সালের ৯ই জানুয়ারি তাঁরা জাতিসংঘের মহাসচিব মি. কফি আনানের কাছে চিঠি দেন, তার মূল বিষয়বস্তু ছিল – 'বিশ্বের প্রতিটি ভাষার প্রতি সম্মান জানানোর জন্য বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস প্রতি বছর পালন করা হোক; এবং যেহেতু বাঙালিরা তাঁদের মাতৃভাষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছে সে জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারিকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হোক।'

১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর সর্বসম্মতভাবে ইউনেস্কোর প্রথম ও দ্বিতীয় কমিশন বাংলাদেশের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অর্থাৎ বিশ্বে ১৮৮টি দেশ কর্তৃক মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য এটি অভূতপূর্ব সম্মানের ঘটনা। ২১শে ফেব্রুয়ারি আজ বাঙালির গর্ব, বাঙালির অহংকার। ■

সহায়ক গ্রন্থ :
একুশের দলিল/ এম আর আখতার মুকুল
একুশের পটভূমি একুশের স্মৃতি/ মতিউর রহমান
ভাষা এবং ভালোবাসার একুশে ফেব্রুয়ারি / জাফরুল আহসান

লেখক: প্রাবন্ধিক

একুশের গল্প

সেলিনা হোসেন

মহিউদ্দিনের দুই ছেলে। একজনের নাম বিপুল, অন্যজন দোলন। বিপুল ক্লাস নাইনে পড়ে, দোলন ক্লাস সেভেনে। দুই ভাই বাবার জন্য খুব গর্ব বোধ করে। স্কুলের সহপাঠীদের যেমন বলে, তেমন আশেপাশের অনেককেও বলে, আমার বাবা একজন ভাষা সৈনিক। বাহান্নর সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাবা ভাষা আন্দোলনের মিছিলে ছিলেন। তাঁর পায়ে গুলি লেগেছিল। বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল মিছিলের কেউ কেউ। বাবা পরে সুস্থ হয়ে যান। সেজন্য বাবা ঠিকমতো হাঁটতে পারেন না। পা টেনে টেনে হাঁটেন।

বন্ধুরা বলে, একুশে ফেব্রুয়ারির দিন আমরা তোর বাবাকে ফুল দিয়ে আসব।

– ওহ, তাহলে বাবা খুব খুশি হবেন।

বিপুল নিজেও হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে কথা বলে।

– তোরা বিকালবেলা আসবি। বাবা সকালের দিকে শহিদমিনারে ফুল দিতে যান। আমি বড়ো হওয়া পর্যন্ত কোনো বছরই বাবাকে একুশ তারিখে শহিদমিনারে না যেতে দেখিনি।

– তোরা যেতি না?

–হ্যাঁ যেতাম। তবে কোনো কোনো বছরে অসুখের জন্য যাওয়া হয়নি। বাবা সব সময় বলতেন, যতদিন বেঁচে আছি আমি একুশের ভোরে শহিদমিনারে ফুল দিতে যাব।

–তিনি এভাবে একুশের শহিদদের স্মরণ করেন।

–হ্যাঁরে বন্ধুরা। বাবার জন্য আমরা দুই ভাই খুব গর্বিত।

–আমরাও ভাষা-সৈনিকের জন্য গর্বিত। তাঁরা আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছেন। এই বছর আমরা চাচাকে ফুল দিতে যাব।

–হ্যাঁ, আসবি। আমি আর দোলন তোদের জন্য অপেক্ষা করব। তোদেরকে মিষ্টি খাওয়াব।

–হুররে, মিষ্টি মিষ্টি।

সবাই মিলে দুহাত উপরে তুলে লাফায়।

স্কুল ছুটির পরে দু'ভাই বাড়িতে গিয়ে বাবাকে এসব কথা বলে। মহিউদ্দিন বলে, ওরা আমার কাছে কেন আসবে? ফুল নিয়ে শহিদমিনারে যেতে বলবি।

–ওরা তো শহিদমিনারে যায়। আমার কাছ থেকে তোমার কথা শুনে ওরা একথা বলেছে।

তুমি টাকা দেবে আমরা ওদের জন্য মিষ্টি কিনে আনব। ফুল আর মিষ্টি দিয়ে আমরা বেঁচে থাকা ভাষা-সৈনিকদের মনে করব।

–আচ্ছা, ভালোই তো। তোদের মা বেঁচে থাকলে এই আসর আরো ভালো জমত।

মহিউদ্দিন দুহাতে চোখ মোছে।

বাবাকে কাঁদতে দেখে ছেলেরাও কাঁদতে শুরু করে।

একটু পরে কলেজ থেকে বাড়িতে ফিরে আসে মহিউদ্দিনের একমাত্র মেয়ে পারিমা। পারিমা বিপুল আর দোলনের বড়ো। বাবার ঘরে গিয়ে দুই ভাইকে কাঁদতে দেখে ওর বুক কেঁপে ওঠে। ওদেরকে কিছু জিজ্ঞেস না করে বাবার পায়ের কাছে বসে কোলে মাথা রাখে। বাবাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। বুঝতে পারে যে বাবা আর ভাইয়েরা মায়ের কথা মনে করছে। বাবা ওর মাথার ওপর দুহাত রেখে ওকে আদর করে। ওর নিজেরও মায়ের কথা মনে পড়ে। মা বলত, পারিমা আমার ফুলের মতো ফুটে থাকা মেয়ে। ও আমার

শান্তি। আমার গলা জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু দিলে আমার মন আনন্দে ভরে যায়। ভোর বেলা ঘুমে থেকে উঠে সামনে এসে বলে, মাগো ঠিকমতো ঘুমিয়েছ তো?

–হ্যাঁ, ঘুমিয়েছি মা।

– সে জন্য তোমাকে ডানাকাটা পরির মতো লাগছে। ও জড়িয়ে ধরে আদর করলে আমার দিন ভালো যায়। আমি প্রতিদিনের কষ্ট থেকে অনেকটুকু রেহাই পাই।

মা নেই। এমন করে আর কোনো দিন কথা বলবে না, ভাবতে গেলে ও নিজেও কেঁদে আকুল হয়। বিপুল আর দোলন বোনের দুহাত ধরে বলে, ওঠ। বাবাকে আর কষ্ট দিও না।

পারিমা উঠে দাঁড়ায়। দুই ভাইয়ের হাত ধরে নাড়ায়। তিন জনে বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, বাবা চলো বাইরে যাই।

–না রে, সোনারা। এখন বাইরে যাব না। পারিমা তুই হাত মুখ ধুয়ে নে। ভাত খাবি না?

–না, বাবা। এই বিকেলবেলা ভাত খাব না। তোরা কী খাবি রে ভাইয়ারা? তাহলে সেটা রান্না করব।

–না, তোমার কিছু রান্না করতে হবে না। মাত্র কলেজ থেকে এসেছ। আমি তেল, কাঁচামরিচ, পেয়াজ দিয়ে মুড়ি মাখাব।

বিপুলের কথা ধরে দোলন বলে, আমার কাছে টাকা আছে আমি দৌড় দিয়ে জিলাপি নিয়ে আসছি। তোমার কিছু করতে হবে না আপু।

–আচ্ছা। তুই যা। বাবা জিলাপি খেতে ভালোবাসে। আমি যাই হাত মুখ ধুয়ে নেই।

পারিমা নিজের ঘরে যায়। বিপুল রান্নাঘরে গিয়ে মুড়ির টিন নামায়। দোলন চলে যায় বাইরে। মায়ের মৃত্যুর পর সংসারের ছবিটা এমন বদলে গেছে। বিপুল আর দোলনের জন্মের আগে ওদের সংসারে আর এক রকম ছবি ছিল। আবার মায়ের কথা মনে হয়। বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে মায়ের ভাবনায় মেতে ওঠে ও। শুনতে পায় মায়ের কণ্ঠস্বর, 'আমার বড়ো ছেলেটি তিন বছর বয়সে মরে যাওয়ার পর থেকে আমি দুঃখের সাগরে ডুবে থাকি। যখন-তখন চোখ ভিজে ওঠে। পারিমার জন্মের পরে এই দুঃখ কমেছে। ওর দিকে তাকালে ওর চোখের দৃষ্টিতে মন ভরে যায়। বড়ো হতে হতে ও আমার বুকের ভেতরে আদরের ছায়া ছড়িয়ে রাখে। কথা বললে বুঝতে পারি ও ভালোবাসা দিয়ে বুক ভরাতে জানে। কষ্ট কমাতে জানে। আমার দুখের সাগরে ও নীলপদ্ম হয়ে ফুটে থাকে। মাগো তুই আমার লক্ষ্মী সোনা। মাগো তোর দেয়া শান্তি নিয়ে ছেড়ে যেতে চাই এই দুনিয়া'। এভাবে মা পারিমাকে নিজের মনের কুঠুরিতে রাখে।

মায়ের কথা এটুকু ভেবে হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ে। ও জানে বিপুল আর দোলনের জন্মের পরে মা আবার অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। পারিমাকে নিয়ে ভাবার সময় ছিল না। ওকে স্কুলে পাঠানোর জন্য ব্যস্ত থাকত। বাড়িতে ফিরলে সন্ধ্যায় বাবা ওকে পড়াতে বসাত। বাবা পড়াত বলে সেই স্কুল-বয়স থেকে ওর অনেক কিছু শেখা হয়েছিল। ভাষা-সৈনিক বাবা ওকে একুশের গল্প শোনাত। একুশের উপর লেখা কবিতা মুখস্থ করাত। ভীষণ আনন্দের দিন ছিল।

বাবা বলত, পারিমা মা আমার শক্তি। ওর দিকে তাকালে আমি ছেলে হারানোর দুঃখ পাশে ফেলে রাখতে পারি। আমার অমিয় না থাকা পূরণ করে দিয়েছে আমার পারিমা। ছেলেটা মরে যাওয়ার পর কাজের শক্তি কমে গিয়েছিল। মেয়েটার দিকে তাকালে ভাবি ও আমার মনে শক্তির বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে। ওকে আমার মাথার উপর বটগাছের ছায়ার মতো মনে হয়। ওর সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারি, কথাকে মাটিতে পড়তে না দিয়ে কীভাবে মাথায় ভরে রাখতে হয়। পারিমার দিকে তাকিয়ে আমি বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখি। আমার স্বপ্ন ফুরিয়ে যায় না।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ানো শেষ হলে দরজায় ঠকঠক শব্দ করে দোলন ওকে ডাকাডাকি করে।

–আপু দরজা খোল। আমি জিলাপি নিয়ে এসেছি। ভাইয়া মুড়ি মাখিয়েছে।

পারিমা দরজা খুলে দোলনকে আদর করে বলে, তুই আমার ছোটো ভাই সোনামানিক। চল সবাই মিলে মুড়ি আর জিলাপি খাব। আমি বাবাকে নিয়ে আসছি টেবিলে।

মহিউদ্দিন সোফার পেছনে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করেছিল। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে ক্লান্তি পেয়ে বসেছে তাকে। ছেলে-মেয়েরা তাকে নানা ভাবে উৎফুল্ল রাখার চেষ্টা করে। সে ভাবে মনে কষ্ট থাকলে ইচ্ছা করে তো উৎফুল্ল হওয়া যায় না।

পারিমা এসে বাবার সামনে দাঁড়ায়। কপালে হাত রেখে বলে বাবা চোখ খোল।

মহিউদ্দিন তাকালে পারিমা বলে, আমার ছোটো দুই ভাই আজ সব আয়োজন করেছে। চলো খাবার টেবিলে গিয়ে বসি।

মহিউদ্দিন উঠে দাঁড়ায়। দুজনে খাবার ঘরে আসে। বিপুল আর দোলন মুড়ি-জিলাপির পাশাপাশি বাটি-গ্লাস দিয়েছে। চায়ের কাপে চা দিয়েছে। ওদের এমন গোছানো কাজ দেখে দুজনের মন ভরে যায়। মা মারা যাবার তিন মাস হয়েছে। এর মধ্যে সবাই মিলে সংসার দেখছে। রান্নার কাজ পারিমাকে করতে হয়।

সবাই মিলে চেয়ারে বসে। বিপুল বাটিতে মুড়ি দিয়ে সবার সামনে এগিয়ে দেয়।

পারিমা ওর মাথায় হাত রেখে বলে, আয় সবাই একসঙ্গে খাই।

–খাই, খাই– চেঁচিয়ে ওঠে দোলন। নিজে দাঁড়িয়ে বাবার মুখে এক চামচ মুড়ি দেয়। বিপুলও ওকে দেখে পারিমার মুখে এক চামচ মুড়ি দেয়। তারপর দুই ভাই হাততালি দিয়ে বলে, ভাষা সৈনিক বাবা আমাদের, ভাষা সৈনিক– পারিমাও চিৎকার করে বলে, বাবা আমাদের গর্ব, বাবা আমাদের অহংকার।

– তোদের জন্য আমি দোয়া করি সোনারা। এখন তোরা মুড়ি-জিলাপি খেয়ে নে।

সবাই একসঙ্গে মুড়ি খায়। মুড়ি শেষ করে জিলাপি খায়। তারপর চায়ের কাপ টেনে নেয়। এভাবে মায়ের মৃত্যুর দুঃখ এবং আনন্দ নিয়ে দিন কাটায় ওরা। শুধু কষ্টে মহিউদ্দিনের বুক টনটন করে। তবে ছেলে-মেয়েদের তা বুঝতে দেয় না।

মাঝে মাঝে ওরা একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা শোনার জন্য বাবার কাছে এসে বসে। পারিমা বলে, একুশের গল্প বলার সময় তোমার মুখ চকচক করে বাবা। মনে হয় এই মাত্র তুমি মিছিল করে বাড়িতে ফিরলে। মাতৃ ভাষার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য এটা তোমাদের যুদ্ধ। তোমরা যুদ্ধে জিতবে মনে করে তোমাদের মুখ থেকে হাসি সরে না। মন ভার হয়ে থাকে না কখনো।

মহিউদ্দিন হাসতে হাসতে বলে, মারে তুই অনেক বুঝিস।

–আমি একটা বিষয় ঠিক করেছি বাবা।

–বলো কী?

–আমাদের বন্ধুদের নিয়ে আসব তোমার কাছ থেকে একুশের গল্প শুনবে। এই ঘটনা তো বাঙালি-বাংলাদেশের ইতিহাস।

–শুধু বাংলাদেশ নারে মা। এটা বিশ্বের ইতিহাসের জন্যও বড়ো ঘটনা। সব জাতিগোষ্ঠীর জন্য মাতৃভাষা মর্যাদা রক্ষা করা খুবই জরুরি। যারা মাতৃভাষার মর্যাদা হারায় তারা বেঁচে থাকার মর্যাদা হারায়।

বিপুল আর দোলন একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে, সেদিন কেন তোমাদের যুদ্ধ করতে হয়েছিল। পাকিস্তান সরকার কী করেছিল?

– ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকার করাচিতে একটি শিক্ষা সম্মেলন করেছিল। সেখানে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দু। পাকিস্তানের জনসংখ্যার পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি। তাদের মাতৃ ভাষাকে বাদ দিয়ে এমন সিদ্ধান্ত বাঙালিরা মানতে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে এই প্রতিবাদ চলতে থাকে। এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্য ছিলেন শহীদ ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত। তিনি গণপরিষদে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।

–তিনি কী তখন শহিদ হয়েছিলেন বাবা?

–না রে বাবা। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান আর্মি তাঁকে ধরে নিয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে রেখেছিল। অনেক নির্যাতন করে মেরে ফেলেছিল।

বিপুল আর দোলন একসঙ্গে বলে, আপু তোমার সঙ্গে আমরা কি রান্না ঘরে থাকব?

–না রে ভাইয়ারা লাগবে না। তোরা খেলতে যা।

–ঠিক আছে যাই। তুমি বাবাকে দেখো।

–হ্যাঁরে, আমি বাবার কাছে থাকব। তোরা মন খারাপ করবি না। সন্ধ্যার আগেই বাড়িতে আসবি।

–আচ্ছা আপু, গেলাম।

বিপুল-দোলন বাবার হাত ধরে বাড়ির বাইরে আসে। বাবার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে, তাড়াতাড়ি আসব। এসেই তোমার সঙ্গে পড়তে বসব।

–যা, যা। খেলে আয়। খেলাধুলা খুব দরকার।

কথা বলতে বলতে মহিউদ্দিন ওদের জন্য মেইন গেট খুলে দেয়। ওরা বেরিয়ে গেলে বাড়ির সামনে কিছুক্ষণ পায়চারি করে ঘরে ঢোকে। বাথরুমে যায়। ফিরে এসে নিজের ঘরে চেয়ার টেনে বই নিয়ে বসে। একুশ নিয়ে লেখা গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-উপন্যাস পড়ে। পারিমা খুঁজে খুঁজে এ ধরনের বই বাবার জন্য নিয়ে আসে। ও বুঝতে পারে এ ধরনের বই পেলে বাবার সময় আনন্দে ভরে ওঠে। অনেক কবিতা বাবা নিজেও মুখস্থ করে ফেলেছে। বিপুল আর দোলনকে মুখস্থ করিয়ে ছিল। এখন ওরা নিজেরাই পড়তে পারে।

রান্নাঘরের কাজ গুছিয়ে রেখে পারিমা বাবার কাছে আসে। শুনতে পায় বাবা জোরে জোরে পড়ছে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতা– 'কুমড়ো ফুলে ফুলে/ নুয়ে পড়েছে লতাটা/ সজনে ডাঁটায়/ ভরে গেছে গাছটা/ আর, আমি ডালের বড়ি/ শুকিয়ে রেখেছি/ খোকা তুই কবে আসবি/ কবে ছুটি?/চিঠিটা তার পকেটে ছিল/ ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা।'

এই কবিতাটি মহিউদ্দিনের খুব পছন্দ। বেশ লম্বা কবিতা। মায়ের খোকা তো কখনো আসবে না। ও শহিদ হয়েছে বলেই তো পকেটে রাখা মায়ের লেখা চিঠিটি রক্তে ভিজে গেছে। বইটা বুকে রেখে চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দেয় মহিউদ্দিন। চোখ বুঁজে রাখে।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে পারিমা। বুকের ওপর বই দেখে বুঝতে পারে বাবা 'একুশের সংকলন' পড়ছে। কবি হাসান হাফিজুর রহমান বইটি সম্পাদনা করেছেন ১৯৫৩ সালে। বাবার খুব প্রিয় বই। একুশের সময় নিয়ে লেখা অনেক কিছু আছে বইয়ের মধ্যে।

মহিউদ্দিন চোখ খুললে দেখতে পায় মেয়েকে।

–আয় মা, আমার কাছে আয়।

পারিমা বাবার সামনে গিয়ে বসে। পায়ে হাত রেখে বলে, তোমার হাজার বছরের আয়ু হোক বাবা। তুমি আমার স্বপ্নে বেঁচে থাক। আমি যখন অনেক বড়ো হব –একজন রবীন্দ্রনাথ কিংবা একজন আইনস্টাইন হব –তখন তোমাকে জড়িয়ে ধরে বলব, আমার স্বপ্নের ফুল ফুটেছে বাবা।

মহিউদ্দিন গদ গদ কণ্ঠে বলে, ও রে মারে তুই আমার সোনার মানিক। তুই আমার চোখের মণি। তুই ছাড়া আমার দুনিয়া অন্ধকার।

– তোমার দুই ছেলে আছে না বাবা।

–আছে তো। মেয়ে তো তুই একা। বিয়ে হলে অন্য বাড়িতে চলে যাবি।

–না, আমি বিয়ে করব না। তোমার কাছে থাকব।

–না, না তা হবে না, তা হবে না। তুই বিয়ে করবি না এটা আমি মানতে পারব না।

পারিমা হাসতে হাসতে বাবার বুকে মাথা রাখে। বাবা ওর মাথায় নিজের কপাল ঠেকিয়ে ভাবে, মেয়েটির মানসিক শক্তি আছে। ও বেঁচে থাকুক হাজার বছর। প্রতিবেশি-আত্মীয়স্বজন সবার মুখে পারিমার কথা বলেন, ওর মতো মেয়ে হয় না। ও সবার জন্য সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। ও জানে, নিজেকে কী করে বড়ো করতে হয়। ও শুধু কলেজে লেখাপড়া করে না। ওর বিদ্যা বুদ্ধিতে অনেক ভাবনা জমে আছে। ও সবকিছু কাজে লাগায়।

মহিউদ্দিন বলে, মারে, কালকে কখন কলেজে যাবি?

–নয়টার দিকে যাব বাবা। তিনটার মধ্যে ফিরে আসব। তোমার কোনো কিছু লাগবে?

–না রে মা, কিছু লাগবে না।

–আমি এখন রান্না ঘরে যাই। কালকের রান্নাটা করে ফ্রিজে রেখে যাব। তুমি বের করে খেয়ে নিও।

–এভাবেই তো দিন কাটছে রে। আমি সব পারি।

মহিউদ্দিন নড়ে চড়ে বসে বলে, এরপর থেকে আমিও ভাত-ডাল রাঁধব। নইলে তোদের পড়ালেখার ক্ষতি হবে।

পারিমা অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে, আমরা একজন কাজের বুয়া রাখি।

–না, দরকার নাই। ছেলে দুটোও যে কী সুন্দর করে কাজ করে তা দেখে আমি খুশি। এভাবে বড়ো হতে থাকলে জীবনযাপন অনেক সহজ হবে ওদের কাছে।

–ঠিক কথা বলেছ বাবা। এভাবে বড়ো হলে ওরা শুধু ভাববে না যে রান্নাঘরের কাজ শুধু মেয়েরা করবে। ওদের কোনো দায় নেই।

–ঠিক বলেছিস মা। সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। যাই বাইরে হেঁটে আসি।

–হ্যাঁ, চলো। আমি তোমার সঙ্গে থাকব। কালকে থেকে ফেব্রুয়ারি শুরু হবে। তোমার স্বপ্নের দিন বাবা।

–শুধু আমার স্বপ্নের দিন না, তোদেরও। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা। মনে রাখিস পুরো সময়টা তোদেরও স্বপ্নের দিন। বঙ্গবন্ধু আমাদের এই স্বপ্নের মানুষ।

–ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত তিনি বাঙালি জাতিকে তৈরি করেছেন। সবাই মিলে মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠা করেছে। বাঙালি জাতি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছে। এমন গৌরবময় জায়গা নিয়ে বেঁচে থাকা কম কথা না।

দুজন গেট খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালে দেখতে পায় বিপুল আর দোলনের সঙ্গে ওদের চার জন বন্ধু ফুল নিয়ে এসেছে। মহিউদ্দিনকে সামনে পেয়ে ছুটে এসে ফুলগুলো এগিয়ে দেয়।

সুরঞ্জন বলে, আপনি আমাদের ভাষা সৈনিক। আপনাকে আমরা শ্রদ্ধা করি।

–বলো, আপনাকে আমরা ভালোবাসি।

সবাই মিলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, আপনাকে আমরা ভালোবাসি ভাষা-সৈনিক কাকু। এবার আমরা সবাই আপনার সঙ্গে শহিদমিনারে যাব।

পারিমা হাত নেড়ে বলে, ঠিক বলেছিস তোরা। বাবাকে নিয়ে আমরা একটা মিছিল বানাব।

–আমরা অনেক ফুল নিয়ে যাব।

কথা বলে লাফ দিয়ে ওঠে মর্তুজা।

পারিমা বলে, চল, সবাই ঘরে চল। তোদেরকে জিলাপি খাওয়াব।

–হ্যাঁ, জিলাপি খাব, জিলাপি খাব।

মহিউদ্দিনের হাত ধরে টানে সুরঞ্জন, মর্তুজা, হামিদ, অজয়। বিপুল আর দোলন পারিমার হাত ধরে বাড়িতে ঢোকে। দু'চারটে ফুল মহিউদ্দিনের হাত থেকে পড়ে গেলে সবাই মিলে কুড়িয়ে ওঠায়। দুহাত তুলে ওরা বলতে থাকে, একুশের ফুল, একুশের ফুল। মহিউদ্দিন হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে। হাসতে হাসতে সবাই মিলে ঢুকে যায় ঘরে। ধুমধাম করে জিলাপি খায় ছেলেরা। পারিমা ওদের সঙ্গে মজা করে। হাসাহাসিতে মেতে উঠে সবাই। তারপর যার যার বাড়িতে চলে যায়। ওদেরকে বিদায় দিয়ে এসে বিপুল আর দোলন বলে, আপু আজকের বিকেলে খুব মজা হলো না?

–হ্যাঁরে খুব মজা হয়েছে। বাবার মনও ভরে গেছে।

–তাহলে আমরা রোজ ওদেরকে আনি?

–নারে ভাইয়ারা রোজ আনিস না। এক একদিন এক এক রকমের মজা হলে ভালো লাগবে।

–ঠিকঠিক। ঠিকঠিক।

দোলন আর বিপুল হাততালি দেয়। বাবা এসে সামনে দাঁড়ায়।

–অনেক মজা হয়েছে রে। এবার হাত মুখ ধুয়ে নে। পড়তে আয়।

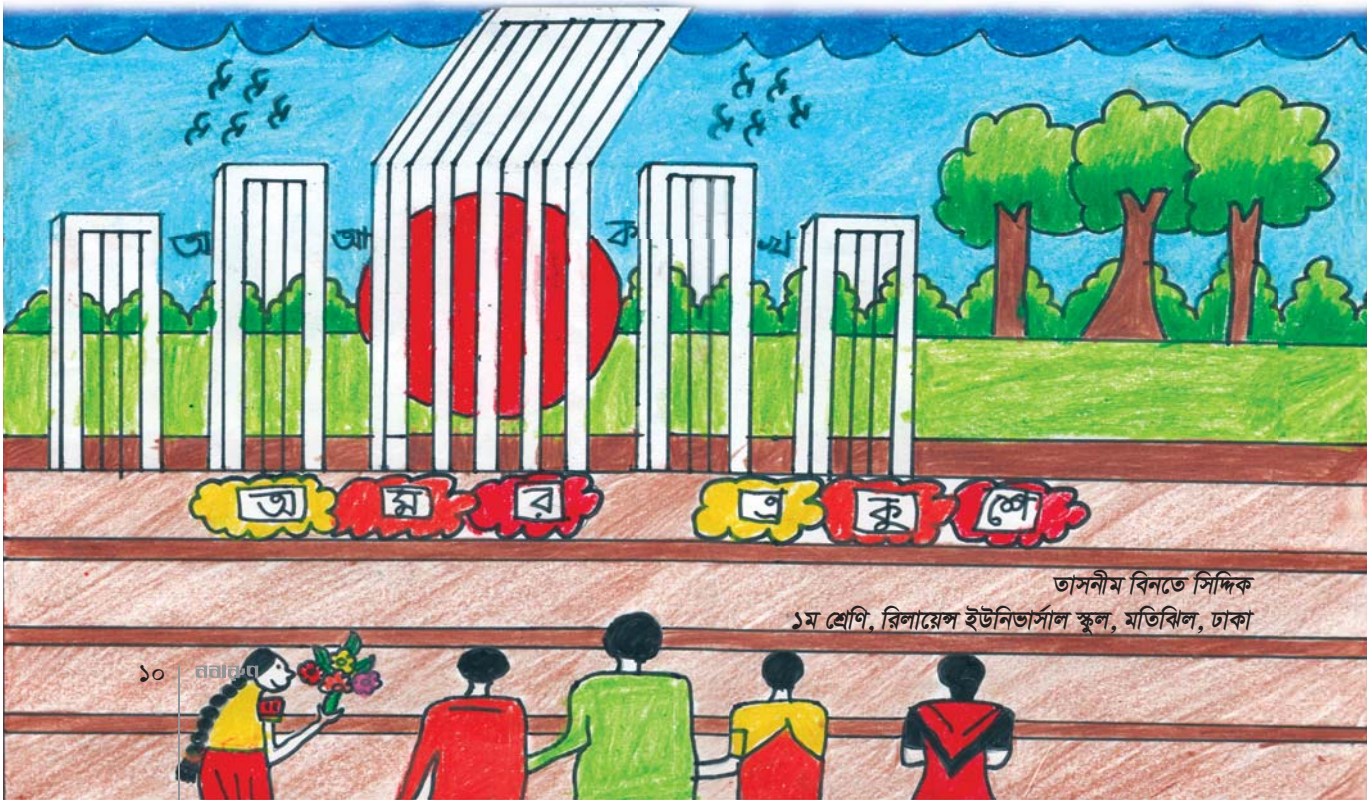

তাসনীম বিনতে সিদ্দিক
১ম শ্রেণি, রিলায়েন্স ইউনিভার্সাল স্কুল, মতিঝিল, ঢাকা

–আসছি বাবা।

দুভাই দৌড়ে নিজেদের ঘরে যায়। পারিমাও নিজের ঘরে ঢোকে। পড়তে বসে। একা হয়ে যায় মহিউদ্দিন। ঘরের এদিক-ওদিকে হাঁটা হাঁটি করে ছেলেদের জন্য অপেক্ষা করে। ভাবে, ওদেরকে পড়তে বসানো এই সময়ের জরুরি কাজ।

অল্প ক্ষণে বিপুল আর দোলন বই খাতা নিয়ে বাবার সামনে এসে দাঁড়ায়।

–চলো বাবা। আমরা তো ডাইনিং টেবিলে বসব।

–হ্যাঁ, দুজনকে নিয়ে বসলে তো ওখানে বসতে হয়। আমি যখন তোমাদের ছেড়ে দেবো তোমরা নিজেদের টেবিলে গিয়ে বসবে।

–হ্যাঁ, আমরা তো তাই করি বাবা।

দুজনে লাফাতে লাফাতে টেবিলে গিয়ে বসে। দুই ছেলের এমন উচ্ছ্বাস ভরা আচরণ দেখে মন ভরে যায় মহিউদ্দিনের। পারিমা পথশিশুদের নানা সহযোগিতা দেয়। এটাও তার আনন্দের জায়গা। ছেলেদের পড়িয়ে ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে মহিউদ্দিন। দুদিন ধরে বাম পায়ে ব্যথা হচ্ছে। পারিমাকে বলেনি। তাহলে ও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেত। ব্যথা তীব্র নয় বলে মেয়েকে ইচ্ছে করে বলেনি। আজকে ব্যথা বেড়েছে। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে মহিউদ্দিন। অস্থির লাগছে খুব।

রাতের খাবার সময় বাবাকে ডাকতে গিয়ে বাবার অবস্থা দেখে ঘাবড়ে যায় পারিমা। কপালে হাত দিয়ে ডাকে, বাবা, কি হয়েছে?

–বাম-পা খুব ব্যথা করছে মারে।

–কালকে তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। ওঠ, ভাত খাবে চল। হাঁটতে পারবে?

– দেখি চেষ্টা করে।

বিছানায় উঠে বসে মাটিতে পা ফেলতেই কষ্ট হয়। আবার বিছানায় বসে পড়ে।

–বাবা তুমি এখানে বসে থাক। তোমার জন্য প্লেটে করে ভাত নিয়ে আসছি।

– তোরাও এখানে বসে আমার সঙ্গে খাবি।

–না বাবা, দরকার নাই। আমরা পরে খাব। তুমি খেয়ে শুয়ে পড়।

পারিমা উঠে গেলে মহিউদ্দিনের মন খারাপ হয়ে যায়। ফেব্রুয়ারি মাসে তার পায়ের ব্যথা হঠাৎ করে বাড়ল। তাকে তো ফুল নিয়ে শহিদমিনারে যেতে হবে। চোখে পানি আসলে দ্রুত মুছে ফেলে। তার চোখে পানি দেখলে মেয়েটাও কাঁদবে। একটু পরে ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে মহিউদ্দিন।

পরদিন সকালে ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার ওষুধ দেয় এবং বলে দেয় হুইলচেয়ার ব্যবহার করার জন্য। বাড়িতে ফিরে আসার পরে জ্বর আসে। বাবাকে শুইয়ে রেখে হুইলচেয়ার কিনতে যায় পারিমা। বিপুল আর দোলন বলে, আজকে আমরা স্কুলে যাব না। বাবার কাছে থাকব।

– থাক, বেশি দুষ্টামি করবি না। বাবার ঘুম যেন ভেঙে না যায়।

–ভাষা-সৈনিক, ভাষা-সৈনিক। ভাষা-সৈনিক বাবা– দুভাই মৃদু স্বরেই কথা বলে।

দুজনে টেনে টেনে বলে, আমাদের গর্ব ভাষা-সৈনিক বাবা। আমাদের ক্লাশে আর কারো কোনো বন্ধুর বাবা ভাষা-সৈনিক নয়। কেউ প্রাণ ভরে শহিদমিনারে যায় না। আমার বাবা, আমার বাবা–

– এই চুপ কর তোরা। থাম। আর কথা বলিস না।

–আমরা দুজন বাবার ঘরের দরজার কাছে বসে থাকছি। দূরে বসলে বাবার ডাক শুনতে পাব না।

–ঠিক আছে, থাক। আমি চেয়ার কিনে আনছি। হইচই করে বাবার ঘুম ভাঙাবি না তোরা।

–এখন থেকে বাবাকে ডাকব ভাষা-সৈনিক, ভাষা-সৈনিক। পারিমা হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়।

দিন গড়ায়। মহিউদ্দিনের পায়ে ব্যথা কমে যায়। কিন্তু হাঁটতে পারে না। হুইলচেয়ারে ঘোরাঘুরি করতে হয়। আবার হাঁটতে না পারা দেখে ওদের মন খারাপ হয়ে থাকে। কিন্তু বাবাকে ভাষা সৈনিক ডেকে আনন্দে রাখে। মহিউদ্দিন ছেলেদের এই ডাক শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়। পারিমা বলে, আমি পথশিশুদের একুশের শহিদ দিবসের কথা শেখাব। আমি ঠিক করেছি এবার শহিদমিনারে নিয়ে যাব ওদেরকে।

–ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছিস মা।

–বাবা, তুমি তো জানো আমি সব সময় ওদের কথা ভাবি।

–জানি রে মা। তোর মাও তোর এসব কাজে খুশি ছিল।

মা, মা বলতে বলতে পারিমা বাবার সামনে থেকে সরে

যায়। পথশিশুদের ও আদর করে। কলেজে যাওয়ার সময় ওদের সঙ্গে দেখা হলে মাথায় হাত রেখে বলে, কী রে কেমন আছিস?

ওরা ওর দিকে তাকিয়ে খুশি হয়। রাস্তায় ঝাড়ু দেয় যে লোকটি তার ছেলে স্কুলে যায় না। বাবার সঙ্গে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে। পারিমার সঙ্গে ওর প্রায়ই দেখা হয়। মাঝে মাঝে ও দৌড়ে এসে বলে, বাদাম খাওয়ার টাকা দাও।

ও আদর করে বলে, ভিক্ষা করতে হয় না রে।

–এটা ভিক্ষা না। আমি ভিক্ষা চাই না। তোমার কাছে এটা আমার দাবি।

– দাবি? পারিমা চোখ বড়ো করে।

–হ্যাঁ, দাবি। তোমার বেশি আছে সেজন্য আমাকে দিতে হবে।

–ঠিক আছে নে।

ওকে পাঁচটা টাকা দিয়ে বলে, স্কুলে যাস না কেন?

–বাবা শুধু খাওয়াতে পারে। স্কুলে পাঠাতে পারে না।

–বড়ো হয়ে তুই কী করবি?

–আমিও রাস্তা ঝাড়ু দেবো। তোমরা বড়ো মানুষেরা রাস্তায় হাঁটলে পরিষ্কার রাস্তা লাগবে না?

–বাব্বা, তুই তো খুব স্মার্ট ছেলে দেখছি। আমি তোকে পড়ালেখা করাব।

–আমি একা পড়ালেখা করব নাকি? আমরা যারা রাস্তায় থাকি তাদের সবাইকে পড়াতে হবে।

পারিমা বুঝে যায় যে ছেলেটি বেশ মেধাবী। ও ওর দিকে চোখ বড়ো করে তাকিয়ে থাকে। ওর সুন্দর চেহারায় নতুন আলো ফোটে। ছেলেটি হাততালি দিয়ে বলে, তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। তুমি আমাদের রানি-মা হও।

–হ্যাঁ, তাই হব। তুই কি আমাকে রানি-মা ডাকবি?

–ডাকব, ডাকব। তুমি তো রানির মতো দেখতে। তোমার মাথায় ফুলের মুকুট দেবো।

পারিমা বাড়ি ফিরে এসে বাবা-মাকে বলেছিল, আমাদের বাড়ির সামনের খোলা জয়গায় আমি পথশিশুদের জন্য স্কুল বানাব। ওদেরকে পড়ালেখা শেখাব। ওদের বই-খাতা-পেন্সিল সব তোমাদের কিনে দিতে হবে।

–ঠিক আছে, তা দেবো। তুই কখন ওদের পড়াবি? তোর নিজেরই তো পড়ালেখা শেষ হয়নি।

–আমি সময় বের করে পড়াব। তুমি আর মাও পড়াবে। বিপুল আর দোলনও ওদের সঙ্গে থাকবে। ওদেরকে একুশের গানটা শেখাবে।

–বাহ, ভালোই তো।

–বাবা, স্কুলের নাম রাখব ভাষা-সৈনিক পাঠশালা।

মহিউদ্দিন বিপুল বিস্ময়ে মেয়ের দিকে তাকিয়েছিল। বলেছিল, একুশ আমাদের ইতিহাস। একুশকে এভাবে আমাদের মাথায় তুলে রাখতে হবে।

কিছুদিন পর শুরু হয় ভাষা-সৈনিক পাঠশালা। আশপাশের পথশিশুরা আসতে শুরু করে। বিপুল আর দোলন পথে যাকে পায় ওদেরকেও ডেকে আনে। পারিমা ওদেরকে বর্ণমালার বই দেয়। একগাদা বই বাংলা একাডেমি থেকে কিনে আনে। বিপুল আর দোলন প্রথমে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি–' গানটি ওদেরকে মুখস্থ করতে শেখায়। তিন-চারদিনের মধ্যে ওরা পুরো গান মুখস্থ করে ফেলে। প্রতিদিনি ওদের ক্লাস হয় না। সময় বুঝে পারিমা ওদেরকে আসতে বলে। তখন তিন ভাই-বোন একসঙ্গে থাকে। মহিউদ্দিনও হুইলচেয়ারে ওদের সামনে বসে থাকে। বেশ জমে উঠেছে পথশিশুদের পাঠশালা।

দেখতে দেখতে ফেব্রুয়ারির কুড়ি তারিখ এসে যায়। পারিমা বলে, বাবা তোমাকে হুইলচেয়ারে করে শহিদমিনারে নিয়ে যাব কাল সকালে।

–যাব মা। যতদিন বেঁচে থাকব শহিদমিনারে যাব।

পরদিন রাস্তায় মিছিল বের হয়। হুইলচেয়ার ঠেলতে থাকে ওরা তিন ভাই-বোন। ওদের চারপাশে জড়ো হয়েছে অনেক শিশু। সবাই মিলে গান গাইছে–'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'।

আশেপাশের লোকজন মহিউদ্দিনকে ভাষা-সৈনিক শুনে ফুল দিয়ে ভরিয়ে দেয়। স্লোগানের মতো বলে, জয় হোক ভাষা সৈনিকের। বড়োদের কথা শুনে ছোটোরাও একই স্লোগান দিতে থাকে।

মহিউদ্দিনের দুচোখ ভরে ভোরের আকাশ দেখে। ফুলের গন্ধ নাকে ঢোকে। শহিদমিনারের সামনে এসে মাথা নত করে বসে থাকে। ■

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক

একুশের যা কিছু প্রথম

শরীফ উদদীন

বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ভাষা আন্দোলন। নিজের ভাষায় কথা বলার, লিখতে পারার, গান গাইতে পারার স্বাধীনতার লড়াইয়ের নাম ভাষা আন্দোলন। তাই বলা হয়, একুশ মানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা নত না করা। একুশ মানে বিজয়ের লক্ষ্যে আত্মত্যাগ। একুশ মানে শাসকের অপতৎপরতা প্রতিরোধ করার অপ্রতিরোধ্য সংগ্রাম, শক্তি, সাহস। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির মহিমার পথ ধরেই আজকের মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ।

ভাষা আন্দোলন আমাদের চেতনার ইতিহাস। ভাষার অধিকার আদায়ের সেই রাজপথ রঞ্জিত করা ইতিহাস এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। আমাদের একুশ এখন বিশ্বের। কিন্তু কেমন ছিল একুশের প্রথম বিদ্রোহের অনুষঙ্গগুলো। খুব জানতে ইচ্ছে করে তাই না বন্ধুরা। সেইসব প্রথম নিয়েই এই লেখা।

প্রথম সংগঠন: ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস নামে ঢাকায় একটি ইসলামী সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়। এটিই ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

প্রথম পুস্তিকা: ১৮ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা। প্রচ্ছদসহ ২০ পৃষ্ঠার। বেরিয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ পাকিস্তানের জন্মের এক মাস পর। কিন্তু এরই মধ্যে ভাষার প্রশ্নে বিরোধের পূর্বাভাস। পুস্তিকাটির শিরোনাম, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা-না উর্দু? বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছিল ১৯৪৭ সাল থেকে। পুস্তিকাটিতে পাকিস্তানের, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা সমাধানের বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া হয় মাত্র তিনটি রচনায়। 'আমাদের প্রস্তাব' শিরোনামের প্রথম রচনায় অধ্যাপক এম আবুল কাসেম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের দুটি রাষ্ট্রভাষা প্রস্তাব করেন। একটি উর্দু ও অপরটি বাংলা। দ্বিতীয় রচনাটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক কাজী মোতাহের হোসেনের। শিরোনাম ছিল 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-সমস্যা'। তিনি লেখেন, 'কোনো দেশের লোকে যে ভাষায় কথা বলে, সেইটাই সে দেশের স্বাভাবিক ভাষা। প্রজা সাধারণের ভাষাই রাষ্ট্রভাষা। অতএব পূর্ব পাকিস্তানের রাজভাষা বা রাষ্ট্রভাষা বাংলাই হওয়া স্বাভাবিক এবং সমীচীন।' তৃতীয় রচনাটির রচয়িতা ছিলেন সাহিত্যিক ও ইত্তেহাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ। শিরোনাম ছিল 'বাংলা ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা'। তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে সাতটি যুক্তি তুলে ধরেন।

প্রথম ভাষার দাবি উত্থাপক: শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁকে বলা হয় ভাষা আন্দোলনের প্রথম ভাষা সৈনিক। ১৯৪৮ সালের ২৫শে আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদে অধিবেশনের সব কার্যবিবরণী ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উত্থাপন করেন তিনি।এটাই ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার গণআকাঙ্ক্ষার সূচনা।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম গল্প : ভাষা আন্দোলনের স্মরণে লিখিত প্রথম গল্পের নাম 'মন ও ময়দান'। এর রচয়িতা হলেন ভাষা সৈনিক ও বিশিষ্ট কথাশিল্পী মরহুম শাহেদ আলী। ১৯৫০ সালে সাপ্তাহিক সৈনিকের 'ঈদ ও আজাদী দিবস' সংখ্যায় গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রথম ভাষা শহিদ: একুশের প্রথম শহিদ রফিকউদ্দিন আহমদ। তিনি ছিলেন মানিকগঞ্জের আবদুল লতিফের বড়ো ছেলে। তাঁর মায়ের নাম রাফিজা খাতুন। সিংগাইর উপজেলার পারিল গ্রামে ছিল তাঁদের বাড়ি। ঘটনার সময় শহিদ রফিকের বয়স হয়েছিল ২৬ বছর। পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের কারণে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ব্যারাকে আশ্রয় নেওয়ার

সময় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন রফিক। গুলিতে তাঁর মাথার খুলি উড়ে যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখনই মারা যান তিনি। প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট ও বায়দুল্লাহর উপস্থিতিতে তাঁর জানাজা পড়ান আজিমপুর মসজিদের ইমাম হাফেজ আবদুল গফুর। সংগোপনে আজিমপুর কবরস্থানের অসংরক্ষিত এলাকায় দাফন করা হয় শহিদ রফিকের মরদেহ।

প্রথম লিফলেটঃ ভাষা আন্দোলনের প্রথম লিফলেট প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি বর্ষণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। লিফলেটটির আকার ছিল প্লেট অনুযায়ী ১/১৬। গুলি বর্ষণের অল্প কিছুক্ষণ পরই হাসান হাফিজুর রহমান, আমীর আলীসহ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের উলটোদিকে ক্যাপিটাল প্রেসে চলে যান। সেখানে গিয়ে হাসান হাফিজুর রহমান লিফলেটের খসড়া তৈরি করেন। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই 'মন্ত্রী মফিজউদ্দীনের আদেশে গুলি' শীর্ষক লিফলেটটি ছাপার কাজ সম্পন্ন হয়। হাসান হাফিজুর রহমান লিফলেটটি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসেন। প্রায় দুই/তিন হাজার লিফলেট ছাপানো হয়েছিল। উৎসাহী ছাত্ররাই এ লিফলেটগুলো চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। চকবাজার, নাজিরা বাজার এবং ঢাকার অন্য সব এলাকাতেও লিফলেটগুলো কর্মীদের মাধ্যমে ঐদিনই ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

প্রথম শহিদমিনারঃ কেন্দ্রীয় শহিদমিনারের যে চেহারা আজ আমরা দেখি, আদিতে তার রূপ কিন্তু মোটেও এমন ছিল না। তখন এটি ছিল ১১ ফুট লম্বা ত্রিস্তরবিশিষ্ট একটি স্তম্ভ। ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২- সালের গভীর রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র নেতা গোলাম মওলা ও তাঁর সহযোগীদের উদ্যোগে স্তম্ভটি গড়ে তোলে প্রায় ৩০০ মানুষ। এদের বেশিরভাগই ছিলেন মেডিকেলের ছাত্র। ২৩শে ফেব্রুয়ারি নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এই স্তম্ভের মূল নকশা করেছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র বদরুল আলম। নকশা থেকে শুরু করে নির্মাণ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি স্তরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন মেডিকেলের আরেক ছাত্র সাঈদ হায়দার। শাসক শ্রেণি বেশিদিন সহ্য করেনি এই মিনার। তৈরির তিন দিন পর ২৬শে ফেব্রুয়ারি মিনারটি শুধু ধ্বংসই করেনি পুলিশ, ধ্বংসাবশেষও নিয়ে যায় তারা। তবে খুব বেশিদিন বাঙালিকে মিনারবিহীন রাখতে পারেনি তারা। চার বছরের মধ্যে আবার তৈরি হয় মিনার। সেই মিনার আরো বড়ো, আরো উঁচু, আরো সংহত।

প্রথম ক্রোড়পত্র ও অঙ্কিত চিত্র বা স্কেচঃ ২১শে ফেব্রুয়ারির পরেরদিন অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় একুশের প্রথম ক্রোড়পত্র এবং প্রথম অঙ্কিত চিত্র। ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেন তৎকালীন 'দিলরুবা' পত্রিকার প্রকাশক এবং এতে স্কেচ আঁকেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম আর লেখেন ফয়েজ আহমদ এবং আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন। বিকেল পাঁচটার মধ্যে কাগজ ছাপা হয়ে যায় এবং পত্রিকার

কর্মীরাই রাজপথে কাগজগুলো বিলি করেন। সেদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে কারফিউ ছিল বলে ৬টার আগেই হাতে হাতে কাগজ বিলি করা হয়ে যায়।

প্রথম কবিতা: একুশের প্রথম কবিতার জনক মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকার গুলি বর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনিই প্রথম কবিতা লেখেন। মাহবুব-উল-আলম রচিত 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' শীর্ষক কবিতাটি ভাষা-আন্দোলন তথা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তিনি সে সময় চট্টগ্রামে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারির ঠিক দুদিন আগে হঠাৎ তিনি জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। ফলে একুশ এবং পরবর্তী সময়ের উত্তাল আন্দোলনে তিনি অংশ নিতে পারেননি। সেই বিক্ষুব্ধ মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন কবিতার মাধ্যমে। ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৭ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকায় কবিতাটি ছাপা হয়। ওই দিনই (মতান্তরে ২৩ ও ২৪শে ফেব্রুয়ারি) লালদীঘি ময়দানের জনসভায় রাজনৈতিক কর্মী হারুনুর রশীদ বিশাল জনসভায় ৫০ হাজার লোকের উপস্থিতিতে কবিতাটি পাঠ করে শোনান। কবিতাটি ছাপানোর সময় চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লার কোহিনূর প্রেসে হামলা চালায় পুলিশ। কিন্তু প্রেসের কর্মীরা আগেভাগেই পাণ্ডুলিপি, সাজানো ম্যাটার ও মুদ্রিত কপি গোপন করে ফেলতে সক্ষম হন। পুলিশ চলে গেলে আবার নতুন করে শুরু হয় ছাপার কাজ। কবিতাটি প্রকাশিত হলে সরকার কবিতাটি বাজেয়াপ্ত করে এবং কবির বিরুদ্ধ হুলিয়া জারি করে। ফলে পূর্ণাঙ্গ কবিতাটি আজও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আর এটি ছাপার অপরাধে কোহিনূর প্রেসের ম্যানেজার দবির আহমেদ চৌধুরী ও প্রথম পাঠক চৌধুরী হারুনুর রশীদকে দীর্ঘ কারাবাস করতে হয়। ১৭ পৃষ্ঠার এই বইটির দাম রাখা হয়েছিল দুই আনা।

একুশের প্রথম ছাপচিত্র: প্রথম ছাপচিত্র অঙ্কন করেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, বায়ান্নর ভাষাকর্মী মুর্তজা বশীর। ছাপচিত্রটির শিরোনাম ছিল 'রক্তাক্ত একুশে'। মুর্তজা বশীর ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ছাত্রহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। শহিদ বরকতের রক্তে তাঁর সাদা রুমাল রঞ্জিত হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আঁকা তাঁর এই ছাপচিত্রটিতে তিনি একজন গুলিবিদ্ধ ছাত্রনেতাকে এঁকেছেন। যিনি মিছিলে গুলি বর্ষণের ফলে পড়ে যান, তার স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ডটি পড়ে যায় এবং তার হাতে থাকা বইটিও মাটিতে পড়ে রক্তাক্ত হয়ে যায়।

শহিদমিনার ধ্বংসের প্রতিবাদে প্রথম কবিতা: '৫২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের হাতে প্রথম শহিদ মিনার ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ রচনা করেন 'স্মৃতিস্তম্ভ'। ঐতিহাসিক এই কবিতাটির কয়েকটি চরণ-'স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো/চারকোটি পরিবার/ খাড়া রয়েছি তো। যে-ভিৎ কখনো কোনো রাজন্য/ পারেনি ভাঙ্গতে।' প্রথম শহিদমিনার ভাঙার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। পুলিশের হাতে প্রথম শহিদমিনার ধ্বংসের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় ইকবাল হলে বসে সঙ্গে সঙ্গেই এই কবিতাটি রচনা করেন তিনি।

প্রথম কবিতা সংকলন: ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় একুশের কবিতার সংকলন। সংকলনটির নাম ছিল 'ওরা প্রাণ দিল'। এটি ২০ বি, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯৬ থেকে বেনু প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বিশ পৃষ্ঠার এ সংকলনটির প্রকাশক-শিবব্রত সেন। এছাড়া সংকলনটিতে লেখা ছিল সম্পাদনা-সহকর্মী, প্রচ্ছদ: গণ আন্দোলনের অংশীদার জনৈক শিল্পী । এদের নাম গোপন করা হয়েছিল নিরাপত্তার কারণে। প্রচ্ছদে ছিল কাঠের খোদাই করা একটি উডকাট চিত্র। তাতে লেখা ছিল, 'বাংলা ভাষার কণ্ঠ রোধ করা চলবে না।' নিরাপত্তার কারণে প্রচ্ছদ শিরোনামে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন ভারতের খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী সোমনাথ হুড়। যে ৭টি কবিতা স্থান পেয়েছিল সেগুলো হলো: শহিদ বাংলা- বিমল চন্দ্র ঘোষ; জন্মভূমি-সৈয়দ আবুল হুদা; ঢাকার ডাক-হেমাঙ্গ বিশ্বাস; পারবে না- মুর্তজা বশীর; জননী গো-নিত্য বসু; বন্ধুর খোঁজে- তানিয়া বেগম; প্রিয় বন্ধু আমার- সহকর্মী (প্রমথ নন্দী)

'একুশের প্রথম সংকলন: একুশের প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' -সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান। '৫৩ সালে পুথিপত্র থেকে এটি প্রকাশ করেন বিশিষ্ট রাজনৈতিককর্মী মোহাম্মদ সুলতান।

আলী আশরাফ, শামসুর রাহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুল গণি হাজারী, ফজলে লোহানী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আনিস চৌধুরী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, জামালউদ্দিন, আতাউর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান হাফিজুর রহমান, শওকত হোসেন, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আনিসুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম, আতোয়ার রহমান, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, তোফাজ্জল হোসেন, কবির উদ্দিন আহমদের লেখায় সমৃদ্ধ এই সংকলনের অসাধারণ স্কেচগুলো করেন মুর্তজা বশীর। হাসান হাফিজুর রহমানের অনুরোধে নিজ হাতে উৎসর্গপত্রটি লিখে দেন আনিসুজ্জামান। পাইওনিয়ার প্রেসের পক্ষে এম এ মুকিত ছেপেছেন

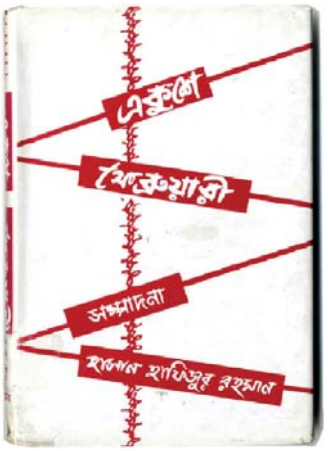

এবং ব্লক তৈরি করেছেন এইচম্যান কোম্পানি, বাদামতলী, ঢাকা। ক্রাউন সাইজের ১৮৩ পৃষ্ঠার এ সংখ্যাটির দাম রাখা হয়েছিল দুই টাকা আট আনা। মায়ের গয়না বিক্রি করে সংকলনটি প্রকাশের টাকা জোগাড় করেছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। এটি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রকাশকের আস্তানায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। শেষ পর্যন্ত সংকলনটিকে নিষিদ্ধ করে সরকার। পরে '৫৬ সালে আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

একুশের প্রথম স্মরণিকা: ঢাকা কলেজ ছাত্রাবাসের পক্ষ থেকে '৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চার পৃষ্ঠার পুস্তিকা শহিদদের স্মরণে একুশের প্রথম স্মরণিকা। এ পুস্তিকাতেই ছাপা হয় আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা একুশের গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। এছাড়া স্মরণিকায় ছিল 'আমাদের কথা' ও 'ভুলি নাই রক্তরাঙা একুশের কথা' শিরোনামে দুটি ছোটো নিবন্ধ। ঢাকা কলেজ ছাত্রাবাসের পক্ষ থেকে জাতীয় জীবনে চিরস্মরণীয়

একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, সেই বীর শহিদদের স্মরণে' উৎসর্গ করা হয় এই স্মরণিকা। এটিতে একটি আবেদনও ছিল: 'নিজে পড়িয়া অপরকে পড়িতে দিন।'

প্রথম উপন্যাস: একুশের প্রথম উপন্যাস জহির রায়হান রচিত 'আরেক ফাল্গুন'। শহিদ দিবস পালন, শহিদমিনার নির্মাণ, আন্দোলন সবকিছুর এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটানো হয় এই উপন্যাসে। উপন্যাসটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় পঞ্চাশের দশকে এবং পুস্তক হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। '৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ঘটনার মাত্র তিন মাস পর ভাষা আন্দোলন ও একুশের ইতিহাস নিয়ে লেখা হয় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। গ্রন্থটির সম্পাদক অধ্যাপক (পরে প্রিন্সিপাল) আবুল কাসেম। '৫২ সালের জুন মাসে 'আমাদের প্রেস' থেকে মুদ্রিত এবং তমদ্দুন লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয় এ বই।

প্রভাতফেরির প্রথম গান: ১৯৫৩ সালে প্রথম শহিদ দিবসের প্রথম প্রভাতফেরিতে গাওয়া হয়- 'মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল/ভাষা বাঁচাবার তরে/আজিকে স্মরিও তারে।' গানটির রচয়িতা বরিশালের প্রকৌশলি মোশারেফ উদ্দিন আহমদ। '৫৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতে লেখা হয়েছিল এ গান। হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ লিখেছেন, 'সেই সংগীতই হয়ে ওঠে অমর একুশের প্রথম বার্ষিকীর প্রভাতফেরির গান। আলতাফ মাহমুদের অপূর্ব সুর সংযোজন। আলতাফের সঙ্গে প্রথম কণ্ঠ মেলান শিল্পী সংসদের নিজামুল হক, মোমিনুল হক, ছাত্রনেতা গাজীউল হক।

একুশের প্রথম গান: একুশের প্রথম গান রচনা করেন ভাষা সৈনিক আ.ন.ম. গাজীউল হক। গানটির প্রথম লাইন: 'ভুলব না, ভুলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব

না...' ভাষা-আন্দোলনের সূচনার গান হিসেবে এটি সে সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং আন্দোলনের মহা অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছিল। গানটির সুর দেওয়া হয়েছিল হিন্দি গান 'দূর হাটো, দূর হাটো, ঐ দুনিয়াওয়ালে, হিন্দুস্তান হামারা হায়' এর অনুকরণে। গাজীউল হকের এই গানটি ছিল ভাষাকর্মীদের প্রেরণার মন্ত্র। শুধু রাজপথের আন্দোলনে নয়, জেলখানায় রাজবন্দিদের মনোবল চাঙা করতে এই গান ছিল প্রধান হাতিয়ার। ১৯৫৩ সালে একুশের প্রথম বার্ষিকীতে আরমানিটোলার ময়দানে আয়োজিত জনসভায় গানটি প্রথম গাওয়া হয়। এ সম্পর্কে গাজীউল হক তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধে ভাষা আন্দোলনের ওপর লেখা এ গানটি আমায় গেয়ে শোনাতে হয়। সময়ের প্রয়োজনেই গানটি লিখেছিলাম। একুশের প্রথম গানের রচয়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরী জানিয়েছেন 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি রচনার আগেই গাজীউল ভাই লিখেছিলেন 'ভুলবো না ভুলবো না '। এটা ছিল তখনকার দিনের রাজপথের গান। সবাই এ গান গাইত।

প্রথম নাটক: একুশের প্রথম নাটকের নাম 'কবর'। নাটকটি লিখেছিলেন আমাদের দেশের সেরা অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, নাট্যকার মুনীর চৌধুরী। ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার 'অপরাধে' ১৯৫২ সালে জেলে আটক ছিলেন মুনীর চৌধুরী ও রণেশ দাশগুপ্তসহ অনেক লেখক-সাংবাদিক। রণেশ দাশগুপ্ত অন্য সেলে আটক মুনীর চৌধুরীকে ভাষা আন্দোলনের ওপর একটি নাটক লিখে দেওয়ার অনুরোধ করে একটি চিরকুট পাঠান। শহিদ দিবসে রাজবন্দিরাই নাটকটি মঞ্চস্থ করবে। জেলে মঞ্চসজ্জা ও আলোর ব্যবস্থা করা যাবে না, তাই মুনীর চৌধুরীকে বলা হয় নাটকটি এমনভাবে লিখতে হবে, যাতে খুব সহজে জেলেই এটি অভিনয় করা যায়। মুনীর চৌধুরী '৫৩ সালের ১৭ই জানুয়ারি নাটকটি লিখে শেষ করেন। ঐ বছরের ২১শে ফেব্রুয়ারি, রাত ১০টায় জেলকক্ষগুলোর বাতি নিভিয়ে দেওয়ার পর হ্যারিকেনের আলো-আঁধারিতে মঞ্চস্থ হয় 'কবর'। এতে অভিনয়ে অংশ নেন জেলেবন্দি সংগ্রামী বন্দি নলিনী দাস, অজয় রায় প্রমুখ।

একুশের প্রথম গল্প: ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র হত্যার পর অর্থাৎ একুশের প্রথম গল্পের নাম 'মৌন নয়ন'। গল্পটির রচয়িতা বিশিষ্ট কবি ও কথাশিল্পী শওকত ওসমান। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত একুশের প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' গ্রন্থে গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রথম সিনেমা: একুশের চেতনা নিয়ে প্রথম নির্মিত সিনেমা জীবন থেকে নেয়া। ১৯৭০ সালে জহির রায়হান সিনেমাটি পরিচালনা করেন। সিনেমাটি সে

সময় ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখে সিনেমাটি।

প্রথম ডাকটিকিট: ১৯৭২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের নিজস্ব প্রথম স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। এতে শহিদমিনারের ছবি স্থান পায়। মূল্যমান ২০ পয়সা এবং ডিজাইনার বি পি চিতনিশ। এই ডাকটিকিটের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো মূল্যমান ছাড়া সবকিছু বাংলা। এ উপলক্ষে একটি উদ্‌বোধনী খামও প্রকাশিত হয়।

প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। জাতিসংঘের ১৮৮টি দেশ

একসঙ্গে প্রথম ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে। এর আগে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের সংস্থা ইউনেস্কো আনুষ্ঠানিকভাবে দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়। বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনের ৩০তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রস্তাবটির খসড়া পেশ করে। বাংলাদেশকে সমর্থন জানায় ২৭টি দেশ। দেশগুলো হলো সৌদি আরব, ওমান, বেনিন, শ্রীলঙ্কা, মিশর, রাশিয়া, বাহামা, ডেমিনিকান প্রজাতন্ত্র, বেলারুশ, ফিলিপাইন, কোতে দি আইভরি, ভারত, হুন্ডুরাস, গাম্বিয়া, মাইক্রোনেশিয় ফেডারেশন, ভানুয়াতু, ইন্দোনেশিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, কমোরো দ্বীপপুঞ্জ, পাকিস্তান, ইরান, লিথুনিয়া, ইতালি, সিরিয়া, মালয়েশিয়া, স্লোভাকিয়া ও প্যারাগুয়ে। ইউনেস্কোর এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাংলাভাষাসহ বিশ্বের চার হাজার ভাষা সম্মানিত হয়। ■

তথ্যসূত্রঃ

১. *ভাষা আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা- রতন তনু ঘোষ*
২. *কাঁদতে আসি নি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি- মাহবুবুল আলম চৌধুরী*
৩. *একুশের উপন্যাস- বাংলা একাডেমি*
৪. *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও একুশের ইতিহাসে প্রথম, এম আর মাহবুব, সূচীপত্র, ২০০৯*
৫. *দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ নভেম্বর, ১৯৯৯ ও ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০০*
৬. *ধীরেন্দ্রনাথ দত্তঃ জীবন ও কর্ম, লেখকঃ মিনার মনসুর, প্রকাশনীঃ বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশঃ ২০১২,*
৭. *ডাকটিকিটে ভাষা আন্দোলন : এ টি এম আনোয়ারুল কাদির, ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ ইং*

লেখকঃ প্রাবন্ধিক

ইশারা ভাষা

মনজুর হোসেন

শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ নড়াচড়া বা ভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করাকে ইশারা ভাষা বলে থাকি। এটিকে ইশারা, সাংকেতিক ভাষা, প্রতীকী ভাষা বা সাইন ল্যাংগুয়েজ নানাভাবে অবহিত করা হয়। যারা কথা বলতে পারে না তারা এই ভাষার মাধ্যমে বাবা-মা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মনের ভাব প্রকাশ করে। হাত ও বাহু ব্যবহার করে এই ভাষায় কথা বলে থাকে। এ ছাড়াও মুখের বিভিন্ন ভঙ্গিমা, কাঁধের ওঠানামা কিংবা আঙুল ব্যবহার করাকে মূলত ইশারা ভাষা হিসেবে গণ্য করা হয়। আঙুল ছাড়াও মুখমণ্ডলের সাহায্য নেওয়া হয়। যারা মূক ও বধির তারা এই ভাষার মাধ্যমে কথা বলে থাকেন। পৃথিবীতে অনেক রকমের বিভিন্ন ইশারা ভাষা রয়েছে। এ ছাড়া অটিস্টিক, নিউরোলজিক্যাল ডিজঅর্ডার ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীগণ ইশারা ভাষা ব্যবহার করে একে অপরের সাথে কথা বলে থাকে। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে অটিস্টিক, নিউরোলজিক্যাল ডিজঅর্ডার ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদেরকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন করা হয়।

সারা বিশ্বে শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধী মানুষের জন্য ইশারা ভাষাই ভাব প্রকাশের একমাত্র উপায়। এ ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে পালিত হয় বাংলা 'ইশারা ভাষা দিবস'। ২০১২ সালের ২৬শে জানুয়ারি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ৭ই ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলা ইশারা ভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। তাই প্রতি বছর নানা আয়োজনে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ইশারা ভাষা রয়েছে। যেমন–আদিবাসী ইশারা ভাষা, নৃতাত্ত্বিক ইশারা ভাষা রয়েছে। বাক প্রতিবন্ধীদের ভাষার জন্য চার হাজার চিহ্ন আছে। ইশারা ভাষার ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো মিলেমিশে কাজ করছে। ■

বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষা ও বর্ণমালা

মো. সিরাজুল ইসলাম

বন্ধুরা, তোমরা হয়ত শুনেছো, বিদ্যাসাগর মাইলস্টোন পড়ে পড়ে গুণতে শিখেছিলেন। বাড়িতে বাতি জ্বলত না বলে রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের নিচে গিয়ে বই মেলে ধরতেন। মায়ের অসুখের কথা শুনে রাতের বেলায় খরস্রোতা দামোদর নদী পাড়ি দিয়েছিলেন। বাবার হাতে ছোটোবেলায় বেদম মার খাওয়া সেই জেদি ছেলেটিই ছোটোদের জন্য 'বর্ণপরিচয়'ও লিখেছিলেন।

হ্যাঁ, আমরা তো বর্ণ সাজিয়ে শব্দ লিখি। স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণ শিখি। অক্ষর দেখলেই আমরা চিনে ফেলি। ধ্বনি মিলিয়ে কথা বলি। এই বাংলা ভাষায় লেখাপড়ার জন্য কী কী বর্ণ বা অক্ষর দরকার, কতগুলো বর্ণ দরকার, কেমন হবে স্বরচিহ্নের ব্যবহার, কেমন হবে যুক্তাক্ষর, কীভাবে শিখব–এসব বিষয়ে 'বর্ণপরিচয়' নামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা বর্ণ শিক্ষার একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন আজ থেকে প্রায় পৌনে দু'শ বছর আগে। আজকে সেসব কথাগুলোই তোমাদের বলব।

বিদ্যাসাগরকে নিয়ে গল্পগুলো

বিদ্যাসাগরকে নিয়ে মজার মজার গল্প লোকমুখে ফিরত সেকালে। একবার যখন তিনি বাড়িতে ছিলেন তখন নৌকা থেকে একজন কোট পরা ভদ্রলোককে নামতে দেখলেন। ঘাটে নেমেই লোকটি এদিক-সেদিক চাইছিলেন, মানে তিনি কুলি খুঁজছিলেন। তাঁর কাছে যে একটা ভারী বোঁচকা ছিল। এগিয়ে গেলেন ঈশ্বরচন্দ্র। তুলে নিলেন বোঁচকাটি। বিদ্যাসাগর খুব সাদামাটা পোশাকে চটি পায়ে ধুতি পরে মোটা চাদর গায়ে চলাফেরা করতেন। তাই সাহেব লোকটি তাকে কুলি ভেবে নিল। কিন্তু রাস্তায় বাঁধল গোল। বোঁচকা মাথায় বিদ্যাসাগরকে অনেকে আদাব জানাচ্ছিল। সাহেবটির সন্দেহ হলো। তবে সে সন্দেহ গভীর হলো না। ওইদিন বিকেলেই বাড়ির ধারের মাঠটিতে একটি বড়ো অনুষ্ঠান ছিল। সাহেব লোকটাও গিয়ে হাজির। দেখেশুনে তার তো চোখ ছানাবড়া। দেখেন কী, ওই কুলি বেটা অনুষ্ঠানের সভাপতি। সাহেব তো পরে কুলি বেটার পায়ে পড়েন আর কী!

আমরা স্কুলে পড়াকালে একটা ধাঁধা বলতাম। আজকে তোমাদেরকেও বলি। বলো তো কোন সাগরে পানি নেই? নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছ। হ্যাঁ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর–এ। বিদ্যাসাগরের জীবনের অনেক ঘটনা রয়েছে যা গল্পের মতোই। গ্রামের পাঠশালাতেই শুরু হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্রের লেখাপড়া ।

১৮২৮ সালের নভেম্বর মাস। ঈশ্বরচন্দ্র বাবার সঙ্গে হেঁটে মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় আসার সময় মাইলস্টোন পড়ে পড়ে নাকি ইংরেজি সংখ্যা শিখে ফেলেছিলেন। জানো, বিদ্যাসাগর এমন এক সময়ে জন্মেছিলেন, যখন বাংলায় লেখাপড়ার সুযোগ বেশি ছিল না। বেশি লোক তখন পড়তই না। ভারতবর্ষে

স্কুল-কলেজ ছিল হাতে-গোনা। তখনো বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল। ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর। পিতা ঠাকুর দাস তাঁকে বেদম উত্তম-মধ্যম দিতেন। খুব জেদি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। পিতামহ নাম রেখেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজে স্বাক্ষর করতেন 'ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা' নামে। ঊনবিংশ শতকের তিনি একাধারে শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও গদ্যশিল্পী। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য প্রথম জীবনেই পান বিদ্যাসাগর উপাধি। ভালো জ্ঞান ছিল ইংরেজি আর বাংলায়ও। রচনা করেছেন পাঠ্যপুস্তক, সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ; সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু রচনা । রবি ঠাকুর তাঁকে বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী বলে গেছেন।

সেকালটা কেমন ছিল

ওই যে একটু আগে বলছিলাম, সেকালে বাংলায় পড়াশোনাই হতো না। সাজানো-গোছানো ছিল না বাংলা বর্ণগুলোও। স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণের আলাদা নাম ছিল না। তারপর যুক্তাক্ষর, চিহ্ন ইত্যাদি ব্যাপার তো বোঝাই ছিল কঠিন। তাহলে বাংলার লোক মাতৃভাষায় পড়ে কী করে? ফারসি বা ইংরেজিই যদি শুধু পড়ার মাধ্যম হয়? রামমোহনসহ সে আমলের বিশিষ্টজনরা চিন্তায় পড়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের দাদা-বাবাও সে দলে পড়েন। ততদিনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, হিন্দু কলেজ বসে গেছে কলকাতায়। সেখানে ছেলেপুলেদের শুধু শেক্সপিয়র পড়ানো হবে? তখনি তৎপর হয়ে গেলেন বাঙালি পণ্ডিতরা। ক্ষেত্রমোহন দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামসুন্দর বসাকদের কথাও মনে রাখা দরকার। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ঘুমও হারাম। মদনমোহন তর্কালঙ্কার লিখেছিলেন 'শিশুশিক্ষা' ঈশ্বরচন্দ্রের 'বর্ণপরিচয়' লেখার ছয় বছর আগে। 'বর্ণপরিচয়' লেখা হয়েছিল ১৮৫৫ সালে। বলো তাহলে, 'শিশুশিক্ষা' কত সালে লেখা হয়েছিল? রামসুন্দর লিখেছিলেন বিদ্যাসাগরের পরে 'বাল্যশিক্ষা'। প্রথম ছাপা হয় কিন্তু ঢাকাতেই। ছাপাখানার নাম সুলভ যন্ত্র। 'বাল্যশিক্ষা' জনপ্রিয় হয়েছিল। তাই ১৮৭৮ সালে কলকাতা থেকেও ছাপা হয়েছিল। তারপর এসেছে 'আদর্শলিপি'। সীতানাথ বসাক এর রচয়িতা। তোমরাও অনেকে দেখে থাকবে। এতে স্বরবর্ণ ছিল ১২টি। এখন অবশ্য বাংলায় স্বরবর্ণ ৯টি। 'আদর্শলিপি'তেই পড়েছি 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি'। কবিতাটি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের লেখা।

বর্ণপরিচয় এর কথা

বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ছাপা হয়েছিল ১৮৫৫ সালের এপ্রিলে আর দ্বিতীয় ভাগ জুন মাসে। দাম ছিল দুই পয়সা। সংস্কৃতের খটোমটো থেকে বাংলাকে মুক্ত করেন বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়' দিয়ে। একবার মফস্বলে স্কুল পরিদর্শনে যাওয়ার সময় পালকিতে বসে নাকি 'বর্ণপরিচয়' লিখে ফেলেছিলেন বিদ্যাসাগর। তিনিই প্রথম সহজ ও ছোটো বাক্য দিয়ে শিশুদের উপযোগী রচনা লেখেন। দুই বা তিন অক্ষরের শব্দ তিনি বেছে নিয়েছিলেন ছোটোদের কথা ভেবে। তিনি আকার, হ্রস্ব-ইকার ছাড়া শব্দ, দুই শব্দের বাক্য, তারপর তিন শব্দের এভাবে চার, পাঁচ, ছয় ইত্যাদি শব্দের বাক্য তৈরি করেন। এভাবে শিশুদের বর্ণ শেখা, ছোটো ছোটো শব্দ শেখা, বর্ণপরিচয়-এর পরীক্ষা, বর্ণ সাজানো ও ফলা সংযোগে বানান শেখার সূচনা করেন। এরপর রয়েছে সহজবোধ্য ছোটো বাক্যের ছোটো ছোটো প্রাঞ্জল গদ্য রচনা। নীতিকথার গল্পমালা। অ-তে অজগর পড়ার রকম কিন্তু বিদ্যাসাগরই দেখিয়ে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের আগের বাংলা ছিল গুরুগম্ভীর, দুর্বোধ্য। তাঁর ছোটো বাক্যের নমুনা দেখো, তাও আবার কী সুন্দর ছন্দময়, বড়ো গাছ। লাল ফুল।

> জল খাও। হাত ধর। বাড়ি যাও।
> মেঘ ডাকে। জল পড়ে। খেলা করে।
> কাল পাথর। সাদা কাপড়। শীতল জল।
> কপাট খোলো। কাগজ রাখো। কলম দাও।
> পাখি উড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে। জল পড়িতেছে।

এভাবে আগেকার অবোধ্য-দুর্বোধ্য শব্দজট মুখস্থ করার পরিবর্তে বর্ণপরিচয় থেকে ছোটোরা পরিচিত শব্দ শিখেছে ও স্বচ্ছন্দ বাংলা গদ্য রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে।

ভাষাকে সহজ করলেন

দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ক্রমে নৈশগগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রদর্শিত পথে কোনো মতে চলিতে লাগিলেন।'

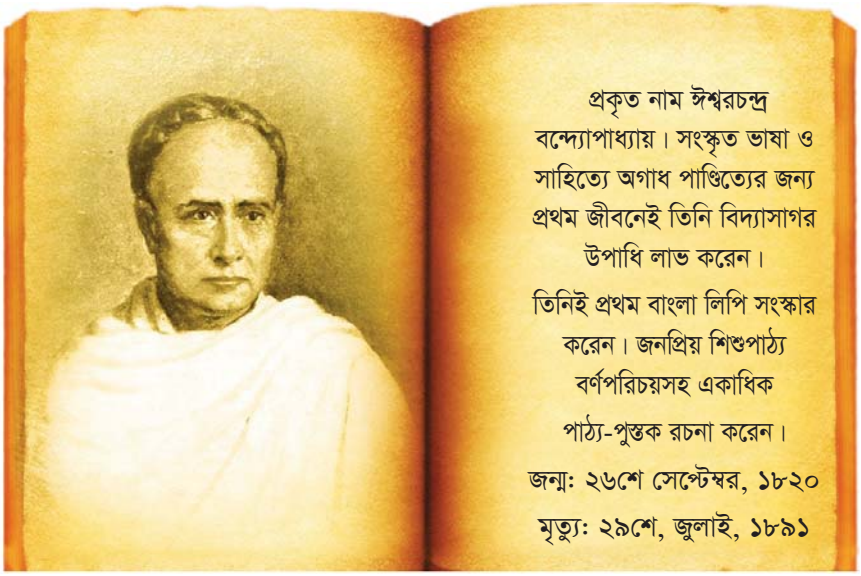

প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য প্রথম জীবনেই তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন।

তিনিই প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করেন। জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচয়সহ একাধিক পাঠ্য-পুস্তক রচনা করেন।

জন্ম: ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮২০

মৃত্যু: ২৯শে, জুলাই, ১৮৯১

এই রকম জটাজাল মতো ভাষাকে বদলে দিতে থাকলেন বিদ্যাসাগর। পুরনো ধাঁচের লেখার সাথে আজকের দিনের খবরের কাগজের যে ভাষা, প্রাঞ্জল কথা সেগুলোই চালু করলেন তিনি। তিনি সহজ, সাবলীল, আধুনিক বাংলা গদ্য লেখার পথ খুলে দিলেন। তিনি ছিলেন বাংলা গদ্যের নব জন্মদাতা। রবীন্দ্রনাথের কথায় বাংলা ভাষাকে আধুনিক করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র।

থামার জন্য বিরতি চিহ্ন

বন্ধুরা, চলতে গেলে থামতে হয়, বলতে গেলে, লিখতে গেলেও। তাহলে এবার শোনো বিরতি চিহ্নের কথা। সে সময় যতি চিহ্নের ব্যবহারও বেশি ছিল না। তখনকার দিনে তো ছন্দময় পুঁথি সাহিত্যের চর্চা ছিল। যার প্রতিটি লাইনের শেষে স্টার (*) চিহ্ন দিয়ে বিরতি দেওয়া হতো। আবার দেখো, যতি বা বিরতি চিহ্নের ওলটপালটে কী দশা হয়!

'আমরা সবাই বসে খাচ্ছিলাম একটি কুকুর। এল ঝড়ের বেগে এক বন্ধু। দেখে ছুটে পালাতে গিয়ে ডিগবাজি খেলেন বাবা। ঠিক সেই সময়ে অফিস থেকে ফিরছেন বাড়ির বেড়ালটা। তাঁকে দেখে দিল দৌড়।'

বিদ্যাসাগর এখানেও ভূমিকা রাখলেন। যেমন 'বর্ণপরিচয়'-এর ১৯ সংখ্যক পাঠে লিখে দিলেন 'গোপাল যখন পড়িতে যায়, পথে খেলা করে না; সকলের আগে পাঠশালায় যায়; পাঠশালায় গিয়া আপনার জায়গায় বসে; আপনার জায়গায় বসিয়া, বই খুলিয়া পড়িতে থাকে; যখন গুরু মহাশয় নতুন পড়া দেন, মন দিয়া শুনে।' বিদ্যাসাগর ইংরেজি সাহিত্যের অনুরূপ বাংলা লেখার জন্যও যতিচিহ্ন বা দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ব্যবহার করে দেখালেন, যা বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা করে।

কী কী বর্ণ দরকার

তিনিই প্রথম বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ লিখেছেন, যা সংস্কৃত ব্যাকরণ অবলম্বন করে হলেও আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বিদ্যাসাগরের দেওয়া কাঠামোর মধ্যেই রয়েছে।

বিদ্যাসাগর বাংলা বর্ণমালার যে সংস্কার করেছিলেন, তা থেকে সামান্যই পরিবর্তন করতে হয়েছে। তাঁর পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণ ১৬টি স্বরবর্ণ চর্চা করতেন। বিদ্যাসাগর স্বরবর্ণ নির্ধারণ করে দেন ১২টিতে। ১২৫ বছর পর স্বরবর্ণের '৯' (লি) বর্ণটি বাদ দেওয়াতে এখন স্বরবর্ণ ১১টি।

ব্যঞ্জনবর্ণ ছিল ৩৪টি। বিদ্যাসাগর তাতে নতুনভাবে ছয়টি বর্ণ যুক্ত করেন। অনুস্বার ও বিসর্গকে স্বরবর্ণ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণে নিয়ে এসে চন্দ্রবিন্দুকেও যোগ করে দিলেন। ড, ঢ, য-এর দ্বিবিধ উচ্চারণের ক্ষেত্রে নিচে ফুটকি বা শুন্য দিয়ে নতুন তিনটি ব্যঞ্জন অক্ষর আবিষ্কার করলেন। 'ৎ' কেও ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত করেছেন। 'ক্ষ' যেহেতু ক ও ষ মিলে হয়,কাজেই সংযুক্তবর্ণ। এজন্য অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনা থেকে বাদ দিয়েছেন। এভাবে তাঁর হাতে ব্যঞ্জনবর্ণ হলো ৪০টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ '৯' -এর মতোই শুধু অন্তঃস্থ 'ব' বর্ণটি বাদ যায়। এখন ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।

এছাড়া সংস্কৃত স্বরবর্ণমালার অন্তর্গত অনুস্বার (ং), বিসর্গ (ঃ), এবং চন্দ্রবিন্দু (ঁ) যেহেতু প্রকৃতপক্ষে ব্যঞ্জনবর্ণ সেহেতু বিদ্যাসাগর এই বর্ণগুলোকে ব্যঞ্জনবর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

তিনি য-ফলাকে ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত করে কমলার কোয়ার মতো না লিখে আলাদা করে লেখার ধারা চালু করেন। ফলে সর্বত্র য-ফলার আকার একই রূপ পেল। বিদ্যাসাগরের আগে ঋ-কার ব্যঞ্জনের তলে বিভিন্ন রূপে বসত। বিদ্যসাগরই প্রথম ব্যঞ্জনের নিচে পরিষ্কারভাবে (২) চিহ্নটি বসিয়ে লেখা চালু করেন। একইভাবে হ্রস্ব-উ কারের জন্য (৯) লেখা চালু করেন।

গত ১৫০ বছরে তাঁর নির্ধারণ করা স্বরবর্ণমালা থেকে কেবল '৯' (লি) ও ব্যঞ্জন বর্ণমালা থেকে 'অন্তস্থ ব' বাদ গেছে। ফলে বলা যায়, আধুনিক বাংলা বর্ণমালার মূল রূপকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিয়ে হতো না!

১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই মারা যান বিদ্যাসাগর। তার আগেই 'বর্ণপরিচয়'-এর প্রথম ভাগের ১৫২টি সংস্করণ হয়ে গেছে। প্রথম তিন বছরে ১১টি সংস্করণে ছাপা হয়েছে ৮৮ হাজার কপি। এ সংখ্যাটিকে এখনো 'এত' বলা যায়। তারপর দেখো ১৮৬৭ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত ২৩ বছরে ছাপা হয়েছে ৩৩ লাখ ৬০ হাজার কপি। এত এত কপি ছাপা মানে তাঁর বই পড়ে শিক্ষারও বিস্তার ঘটেছিল। বিদ্যাসাগর যদি ড, ঢ, য এই তিনটি বর্ণের নিচে বিন্দু দিয়ে ড়, ঢ়, য় বানিয়ে না দিতেন তাহলে তো আমাদের বিয়ে লেখা মুশকিল হতো। আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হয়ত আসত না। এখানে বলা যায় যে, বিদ্যাসাগরের সংস্কারগুলো সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, তা বলা যাবে না। তবে তাঁর সংস্কারকৃত বর্ণমালার প্রকৃতি ও সংখ্যাই আমরা আজও অনুসরণ করছি। বর্ণ চিনতে, স্কুলের বইতে, লেখাপড়ার কাজে লাগাতে পারছি ।

শিক্ষা-সমাজ সংস্কারে অদম্য

তিনি ছিলেন নারীশিক্ষা বিস্তারের অগ্রপথিক। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদের অতিরিক্ত সহকারী স্কুল পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনকালে ১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাস অবধি সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮৮টি।

তিনি একজন বিদ্রোহী বাঙালি এবং খাঁটি মানুষ। ছিলেন গরিবের বন্ধু। বিদ্যাসাগর ধনী ছিলেন না তবুও দরিদ্র, আর্ত ও পীড়িত জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন 'দয়ার সাগর' নামে। বাংলায় তীব্র দুর্ভিক্ষকালে বিদ্যাসাগর অন্নছত্র খুলে অভুক্তদের দু'বেলা খাইয়েছেন।

খ্যাতনামা বেতার বিবিসি বাংলার ২০০৪ সালের জরিপে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তাঁর স্থান অষ্টম।

দুর্নিবার সাহসী বিদ্যাসাগর কি সব কাজেই একরোখা ছিলেন? না। গঠনমূলক, সৃজনশীল কাজে, সমাজ সংস্কারে তাঁর লক্ষ্য বাস্তবায়নে ছিলেন অনমনীয়, কঠোর, আপোশহীন। ছিলেন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন। ইংরেজকেও তিনি তোয়াক্কা করতেন না। বিধবা বিবাহ ও নারীশিক্ষার প্রচলন, বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহের মতো সামাজিক অভিশাপ দূর করতে তাঁর অক্লান্ত সংগ্রামের কথা স্মরণ করতে হয় শ্রদ্ধার সঙ্গে। মাতৃভক্তি ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম গুণ। হোমিওপ্যাথি শিখে কাজে লাগিয়েছেন, অশিক্ষিত অন্নহীন অরণ্যবাসী সাঁওতালদের স্বাস্থ্যসেবায়। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, বেশভূষা গ্রহণ করেননি। শিক্ষার প্রসার, সমাজ সংস্কার, নারী কল্যাণ, নারী বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পাঠ্যসূচি তৈরি, সাহিত্য রচনা, অনুবাদ করা, পুস্তক ব্যবসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাজনীতি মুক্ত করা, চিকিৎসা সেবার বিস্তার, মিতব্যয়ী অথচ দয়ার সাগর- এত বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল তাঁর বিচিত্র চারিত্রিক গুণাবলি আর কর্মময় জীবন।

দেখো নবারুণ বন্ধুরা, বিদ্যাসাগর-এর রসবোধ কেমন ছিল। তাঁর এক বন্ধু কথার ছলে বলেছেন, 'মনের ভুলে আমি সেদিন পাঁচশত টাকার নোট পুড়িয়ে ফেলতে যাচ্ছিলাম।' বিদ্যাসাগর তখন বললেন, 'অন্যমনষ্কতার কথা আর বলো না বন্ধু। একবার রাতে বের হয়েছিলাম। ঘরে ফিরে মনের ভুলে হাতের লাঠিটাকে বিছানায় শুয়ে দিলাম, আর আমি দরোজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকলাম সারারাত!'

জন্মের দুশ বছর পরেও অনন্য সব ভূমিকা আর কীর্তির জন্য বিদ্যাসাগরকে আমরা স্মরণ করি পরম শ্রদ্ধায়। বন্ধুরা, বড়ো হয়ে বিদ্যাসাগরকে আরো বেশি করে জেনে নিও, কেমন। ■

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সরকারি বিএল.কলেজ, খুলনা

ভাষা সংগ্রামী শেখ মুজিবুর রহমান এবং লোকায়ত ইতিহাস

সাইমন জাকারিয়া

মাওলানা ভাসানীসহ প্রভাতফেরিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩

একথা সবাই জানে যে, ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকার রাজপথে প্রাণ দিয়েছিলেন সালাম, রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার। সেই দিনটি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সারা পৃথিবীতে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এটা বাংলা ভাষা প্রেমী মানুষের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

কিন্তু অনেকের হয়ত জানা নেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কবে থেকে শুরু হয়েছিল। আর সেই সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা।

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন আইন পরিষদে 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে' বলে ঘোষণা দেন। সেই সময় যারা সেই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য কর্ম তৎপরতা শুরু করেন। সর্বস্তরের ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রতিবাদী কর্মসূচি শুরু করেন।

জানা যায়, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ২রা মার্চ ভাষার প্রশ্নে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফজলুল হক মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ বাংলা ভাষা নিয়ে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১১ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে।

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মার্চ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমান আন্দোলন করেন এবং এই দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে সহকর্মীদের সাথে সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভরত অবস্থায় তিনি গ্রেফতার হন। শেখ মুজিবের গ্রেফতারের ফলে সারাদেশে ছাত্র সমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মুসলিম লীগ সরকার ছাত্রদের আন্দোলনের চাপে শেখ মুজিবসহ গ্রেফতারকৃত ছাত্র নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি লাভের পর ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় শেখ মুজিব সভাপতিত্ব করেন।

এছাড়া, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি জেলায় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলেন। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফরিদপুরে গ্রেফতার করেন। একটানা প্রায় ৬ মাস বন্দি থাকার পর ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আবার রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে দেশব্যাপী জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে সফর শুরু করেন। এরপর নানা সংগ্রামী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এগিয়ে যেতে থাকেন।

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঢাকা সফরে এসে আবারও ঘোষণা করেন যে, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। এর প্রতিবাদে সংঘটিত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে দুর্বল ও স্তিমিত করার লক্ষ্যে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৭ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাবন্দি অবস্থায় অনশন ধর্মঘট পালন করেন। অনশন ধর্মঘটের পাশাপাশি তিনি ২১শে ফেব্রুয়ারি রাজবন্দি মুক্তি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি দিবস হিসেবে পালন করার জন্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান। জেলখানা থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়ে অনশন ধর্মঘটরত অবস্থায় ১৮ই ফেব্রুয়ারি তাঁকে ঢাকা জেল থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়।

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকারীদের মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর শহিদ হন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানা থেকে এক বিবৃতিতে ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে কারাগারে বন্দি অবস্থায় ১৬ই ফেব্রুয়ারি একটানা ১১ দিন অনশন অব্যাহত রাখেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেল থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই ইতিহাসকে বাংলাদেশের সাধক কবিগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

সুনামগঞ্জের সাধক কবি বাউল কামাল উদ্দিন ওরফে কামাল পাশার গানে ভাষা সংগ্রামী বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাউল কামাল পাশা ছিলেন শাহ আবদুল করিমের চেয়ে বয়সে ১৩ বছরের বড়ো এবং তাঁরা দুজনেই সুনামগঞ্জ জেলার দিরাইয়ের অধিবাসী। শুধু তাই নয়, শাহ আবদুল করিমের যে 'আত্মস্মৃতি'তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে গান পরিবেশনের কথা লিখে রেখেছেন তাতে বাউল কামাল উদ্দিনের কথাও লিপিবদ্ধ রয়েছে। শাহ আবদুল করিম লিখেছেন–

পরে নির্বাচনের ডাক যখন পড়িল।
বিরোধীগণ মিলে সবাই যুক্তফ্রন্ট গড়িল॥
বিরোধী বলিতে তারা বহু দল ছিল।
আওয়ামী [মুসলিম] লীগ প্রধান ভূমিকা তখন নিল॥
গানের আসরে যখন গান গাইতে যাই।
মধ্যে মধ্যে গরিবের দুঃখের গান গাই॥
গান গাই–আসলে অর্থ সম্পদ নাই।
যেখানে লোকে চায় সেখানেই যাই॥
জগন্নাথপুর আসর করার দায়িত্ব নিলাম।
আমি এবং কামাল উদ্দিন দুইজন ছিলাম॥

শাহ আবদুল করিমের এই বর্ণনা হতে বোঝা যায় কামাল উদ্দিন ওরফে বাউল কামাল পাশা ও শাহ আবদুল করিম একাত্ম হয়েই ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের পাকিস্তান পার্লামেন্ট নির্বাচনের সময় যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনী গানের আসর করেন। কিন্তু বাউল কামাল পাশার কোনো পূর্ণাঙ্গ রচনাসমগ্র অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি বলে তাঁর পরিবেশিত গানগুলো নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।

কামাল পাশার জীবনীর তথ্য-উপাত্ত পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর সুনামগঞ্জ জেলার দিরাইয়ের ভাটিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নানকার আন্দোলন থেকে শুরু করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে গণভোট, ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে, ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ৬ দফার পক্ষে, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে সংগীত পরিবেশনসহ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পাকিস্তানি শাসকদের গুলিতে নিহত শহিদদের স্মরণে এবং সেই হত্যার বিরুদ্ধে মাত্র ৬ দিনের ব্যবধানে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি সুনামগঞ্জের দিরাই থানার রাজানগর কেপিসি স্কুল প্রাঙ্গণে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়, উক্ত সভায় বাউল কামাল পাশা তাঁর নিজের লেখা ও সুর করা একটি প্রতিবাদী সংগীত পরিবেশন করেন। কামাল পাশার সুযোগ্য শিষ্য বাউল সাহাব উদ্দিন তাঁর স্মৃতিসত্তায় গান রক্ষা করেছেন। সম্প্রতি গানটি আমাদের হস্তগত হয়েছে। গানটি হলো–

ঢাকার বুকে গুলি কেন? নুরুল আমিন জবাব চাই
ও সে উর্দু প্রেমে মন মজাইয়া, মারলো কতো শহিদ ভাই।
ও সে উর্দু প্রেমে মন মজাইলো, করলো কত রং বড়াই॥
শেখ মুজিব কারাগারে, আন্দোলন কেউ নাহি ছাড়ে
সত্যাগ্রহে এক কাতারে, সামনে আছেন সামাদ ভাই॥
ওয়ান ফোরটি ফোর জারি করলো, নির্বিচারে ছাত্র মারলো
কত মায়ের বুক খালি হইলো, সে কথাতো ভুলি নাই॥
সালাম বরকত রফিক জব্বার, হলেন শহিদ বাংলা ভাষার
একটাই দাবী কামাল পাশার, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই॥

উপরোক্ত গানের বাণীতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গভীর সম্পৃক্ততার ইতিহাসের সত্য উচ্চারিত হয়েছে। এই সত্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও দেশরত্ন শেখ হাসিনা সম্পাদিত 'সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দি ন্যাশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাংলাদেশের প্রান্তিক পর্যায়ের সাধক কবিদের রচনার মধ্যে বাউল কামাল পাশা একই ইতিহাস গ্রন্থন-করে ইতিহাস রচনায় নিজের দায়িত্বশীলতার সাক্ষর রেখেছেন। আমাদের বিশ্বাস অনুসন্ধান করলে ভাষা সংগ্রামী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে সাধক কবিদের আরো অনেক গান আবিষ্কার করা যাবে। ■

তথ্যনির্দেশ

শেখ হাসিনা, 'ভূমিকা', শেখ মুজিবুর রহমান, কারাগারের রোজনামচা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

শেখ হাসিনা, 'ভূমিকা', শেখ মুজিবুর রহমান, কারাগারের রোজনামচা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), বঙ্গবন্ধু কোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

শুভেন্দু ইমাম (সঙ্কলিত ও গ্রন্থিত), শাহ আবদুল করিম রচনাসমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩

মজিবুর রহমান (সঙ্কলিত ও গ্রন্থিত), বাউল কামাল পাশা গীতিসমগ্র, দিয়ারিশ তালুকদার ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

আল-হেলাল, 'বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রথম গানের গীতিকার সুরকার বাউল কামাল পাশা', দৈনিক খবরপত্র, ২১ নভেম্বর, ঢাকা, পৃ. ৬

লেখক: প্রাবন্ধিক

বঙ্গবন্ধু

মিনহাজুল ইসলাম

টুঙ্গিপাড়া জন্ম তাঁর
সবাই তাঁকে চিনে
তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে
সারা দুনিয়ার কোণে।

ভালোবাসতেন খুব বেশি
দেশ ও দেশের মানুষকে
কোনোদিন ভুলবে না কেউ
প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুকে।

১০ম শ্রেণি, টেকনিক্যাল স্কুল, চাঁদপুর

বাঙালির পিতা

মো. গোলাম রাব্বানী

ওগো বঙ্গবন্ধু তুমি এ বাঙালির পিতা
একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মদাতা ;
তোমার কণ্ঠে বেজেছিল স্বাধীনতার কবিতা
তুমিই ছিলে স্বাধীনতা।
বাঙালি রাত পোহালে
করে কবিতা–গান
তুমি তো ছিলে লাল-সবুজের
পতাকার প্রাণ।
তোমার জন্মশতবার্ষিকীতে কত
গল্প-উপন্যাস-ছড়া-কবিতা-গান
বেজে উঠবে বাঙালির পাতাল-আসমান!
তোমার জন্মশতবার্ষিকী আজি গাঁথি ফুলেল কাননে
স্বাধীনতার বীজ বপনে।
গাইবে পাখি - গাইবে সমুদ্র হিল্লোল - আসমান
ওহে বঙ্গবন্ধু তোমার গান।
শতবর্ষই নয় - হাজারো বর্ষে হবে
তোমার তরে বাঙালির শ্রদ্ধাঞ্জলি
তবে আজি এই শতবর্ষে আমার সামান্য উপহার
গানেরই কলি।

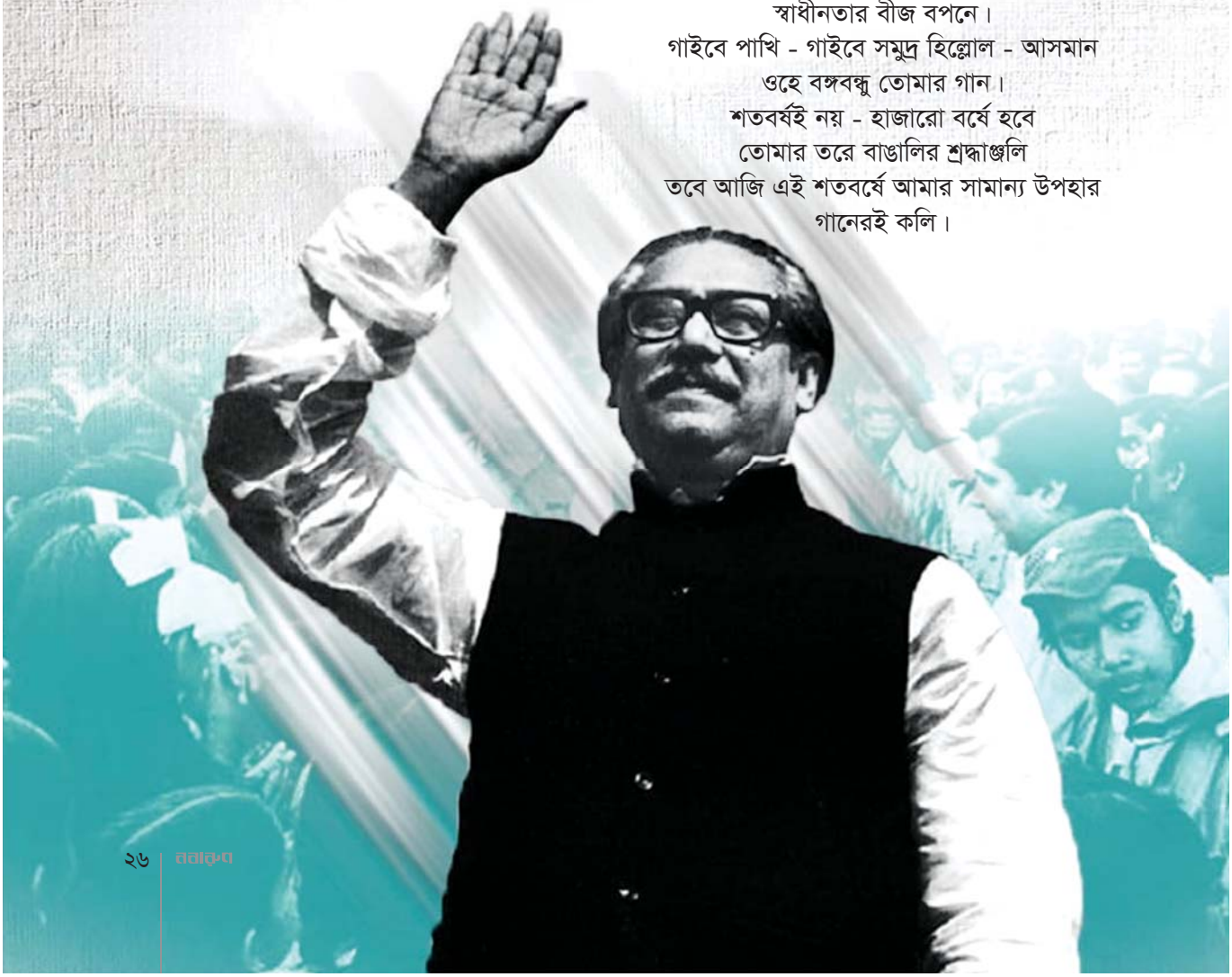

আমার তোমার শেকড়

নাসীমুল বারী

বাড়িটি দোতলা।

স্থাপত্য পরিকল্পনা মনে ধরার মতোই শুধু নয়– ইতিহাস হওয়ার মতোও। বাড়িটির বাসিন্দা মালিক সামিউল হক। অর্থের তো ঘাটতি নেই– সাথে যুক্ত হয়েছে চিন্তা, রুচি আর ইচ্ছা। তাই তৈরি হয়েছে ভিন্নমাত্রার মনে জায়গা করে নেওয়ার মতো অপরূপ এ বাড়িটি। অজপাড়াগাঁয়ের এ বাড়িটির দিকে যে একবার তাকায়– সাথে সাথেই চোখ ফেরায় না; একটু থমকে দাঁড়ায় বটে।

বাড়িটির সামনে দিয়ে যাচ্ছে শিবলী, নাকিব, অরুন– তিন বন্ধু। হঠাৎ দাঁড়িয়ে অরুন বলে, দেখ বাড়িটা!

–মানতেই হবে দেখার মতো বাড়ি। একবার দেখি, বারবার দেখি।

একটু হেসে শিবলী বলে এই কথা। সাথে সাথে নাকিব বলে, আমি ঠিক ওইভাবে ভাবছি না, বাড়িটার ডিজাইন-সজ্জায় একটা নিগুঢ় অর্থবোধ আছে বলে মনে হয়। আমি সেটা নিয়ে ভাবছি।

অরুন তাচ্ছিল্যের সাথে বলে- ধ্যাৎ, তুই সব কিছুতেই অর্থ খোঁজার চেষ্টা করিস। সুন্দর একটা দালানের আবার অর্থবোধের কী আছে? আর্কিটেকচার ডিজাইন করেছে, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছে, রাজমিস্ত্রি ইট-সিমেন্ট গেঁথেছে। এই তো ঘটনা। এখানে আর্কিটেকচারের ডিজাইন সেন্সটাই মূল।

অরুনের কথা শেষ হতেই শিবলী বলে- ও যে এত কথা বলল, তাতেও নিশ্চয়ই কোনো অর্থ আছে, তাই না রে নাকিব?

শিবলীর খোঁচামারা এ কথায় শান্তভাবেই নাকিব বলে- ঠিক বলেছিস। ওর কথাটার খুবই চমৎকার একটা অর্থ আছে। ভালো একটা কথা আছে।

–অর্থ আছে এখানেও?

শিবলী চমকে যায়। অরুন তো চমক আর উৎসাহ নিয়েই জিজ্ঞেস করে– দোস্ত, অর্থ! আমি বললাম কথা আর তুই আবিষ্কার করলি অর্থ? তাড়াতাড়ি বল না অর্থটা।

এবার একটু হেসে নাকিব বলে- শোন, রবীন্দ্রনাথের 'ছোটো প্রাণ ছোটো ব্যথা/ ছোটো ছোটো দুঃখ কথা/ নিতান্তই সহজ সরল' কবিতাটি পড়েছিস তো? সমাজ-সভ্যতা এ কবিতার কী অর্থ বের করল?

–কী আর! ওটা তো ছোটোগল্পের স্বরূপ, অস্তিত্ব। এক কথায় ছোটো গল্পের সংজ্ঞা। কে না জানে এটা!

–হ্যাঁ এখানেই আমার কথা। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ওটা ছোটোগল্পের সংজ্ঞা হিসেবে লিখেননি। তাঁর বিখ্যাত অনেক গল্পই ওই কবিতা অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পারেনি। পোস্টমাস্টার, অপরিচিতা, ঘাটের কথা, একরাত্রি ইত্যাদি পড়ে দেখিস। রবীন্দ্রনাথ মূলত বর্ষার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে 'বর্ষাযাপন' নামের একটি কবিতার অংশ ওইটুকু। বুঝলি?

–তাই নাকি! আচ্ছা বুঝলাম। তিনি অনেক বড়ো, তাই তার কথা বা লেখার মধ্যে দার্শনিকতা পাওয়া যায়। কিন্তু আমার সাধারণ একটা কথায় এমন কী ভিন্ন অর্থ আছে? কিংবা এটা তো একটা সুন্দর বাড়ি, এটার এমন কী ভিন্ন অর্থ আছেরে?

–আচ্ছা, এই যেমন তুই কী যেন বললি? আর্কিটেকচার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আর রাজমিস্ত্রি মিলে বানিয়েছে- তাই তো?

–হুম, একদম সোজা কথা।

–এ কথাটা আমাদের সমাজে ক'জন জানে, ক'জন মানে? তুই তো বললি সহজ কথা। বাড়ি বানিয়েছে এমন যে কাউকে বললে কী বলবে জানিস? বলবে কন্ট্রাক্টর বানিয়েছে কিংবা ডেভেলপার বানিয়েছে। আসলে ওই দুই দল কাজের সমন্বয়ক মাত্র। বাড়ি তৈরি কিন্তু এই তিন মেধার হাত দিয়ে। এই মূল তত্ত্বটা তুই ধরতে পেরেছিস, এটা ভিন্ন অর্থ বহন করে না?

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে দুই জন। হাসতে হাসতেই শিবলী বলে, দোস্ত দারুণ অর্থ বের করলি। হেব্বি ফিলোসোফার তুই! আমার হেঁয়ালি কথাকে তুই গুরুত্বপূর্ণ করে দিলি। দোস্ত তোর সঙ্গ ছাড়া যাবে না।

–কেন?

–ফিলোসোফারের সাথে থাইকা যদি একটু-আধটু নিতে পারি।

একটু মুচকি হেসে নাকিব বলে, ধ্যাত ফাজলামো করিস না।

–না রে দোস্ত সত্যি বলছি। এবার বল বাড়িটার নেপথ্য অর্থটা। শুনি তুই কী ভাবিস?

ততক্ষণে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ছেড়ে এগিয়ে গেছে কিছুদূর। নাকিব বলে, কাল বিকেলে বলব। তারপর সামিউল চাচারে জিজ্ঞেস করব, আমার চিন্তাটা ঠিক কিনা?

সামিউল হক– এ গ্রামেরই মানুষ। জন্ম-জন্মান্তরে এখানেই শেকড় গেঁথে রয়েছে তাঁর। বেড়েও উঠেছেন এ গ্রামেই। এখন অবশ্য ঢাকায় থাকেন। দেশের পরিচিত শিল্পপতির একজন সামিউল হক।

ঢাকা থেকে নিজস্ব গাড়িতে সোয়া দুই ঘণ্টার দূরত্বে এ বাড়িটির অবস্থান। গ্রামের প্রতি রক্তপ্রবাহের খরস্রোতা মন আছে বলেই এমন একটা বাড়ি এখানে করেছেন। ঢাকায়ও করতে পারতেন, তেমন জায়গাও আছে– কিন্তু করেছেন এখানে, এ পাড়াগাঁয়ে।

সামিউল হক মাঝবয়েসি।

হাফ সেঞ্চুরি করেছেন কিন্তু এখনো বয়সের ফার্স্ট ডিভিশন পাননি।

সমাজসেবক হিসেবে এলাকায় সুনাম আছে; বদনামও রটেছিল এক সময়। সমাজসেবা মানেই হলো উনি নির্বাচন করবেন। এখন তো নির্বাচনে আগ্রহীরাই সমাজসেবক। গরিবের বন্ধু। এমন রাজনীতিবিদরা এলাকার তৈরি থাকা পুরোনো স্কুল-মাদ্রাসা কিংবা মসজিদে কয়েক বস্তা সিমেন্ট, কিছু ইট-পাথর দিয়ে ছবি আর পোস্টারে বিশাল সমাজসেবক হয়ে যান। কিংবা সরকারি উন্নয়নের নির্ধারিত বাজেটের অর্থ এনেও বনে যান সমাজসেবক, দানবীর।

এ গ্রামেরই প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ আদর্শ হাই স্কুল। এর ভগ্নপ্রায় ঝুঁকিপূর্ণ টিনের ঘরটির বদলে মনোরম বহুতল দালান তৈরি করার ইচ্ছা করে সামিউল। সাথে সাথেই রটে যায় তিনি এবার নির্বাচন করবেন। নির্বাচনের মৌসুমী কর্মীরা টাকা রোজগারের আশায় সামিউলের সহযোগী হয়ে ওঠে। যথাসময়ে স্কুলের দালান তৈরি হয়। সামিউল নিশ্চয়ই নিজের নামে শ্বেতপাথর লাগিয়ে উদ্‌বোধন করবেন। ক'মাস পরে উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানের তারিখ পড়ে। এলাকাবাসী জানে না কে উদ্‌বোধন করবেন। শ্বেতপাথরে কার নাম থাকবে। এমন একটা বড়ো কাজের জন্য পোস্টারে পোস্টারে এলাকা ছেয়ে যায়নি। এলাকাবাসী ভাবছে এমন কৃপণতা নিয়ে ইলেকশন করবে! এক সময় মুখে মুখে জানাজানি হয়- উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানের সভাপতি সম্মানিত এমপি সাহেব।

তাহলে উদ্‌বোধক সামিউল হক- নিশ্চিত হয় সবাই।

না, সামিউল হক উদ্‌বোধন করেননি। শ্বেতপাথরের কোথাও তাঁর নাম নেই। উদ্‌বোধন করেছেন এ ইউনিয়নের প্রবীণ ব্যক্তি জনাব আবু ছাঈদ মো. আবদুল্লাহ।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ সারা প্রদেশে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। এর সমর্থনে সারা প্রদেশে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি হতে থাকে। আবু ছাঈদও এগিয়ে আসেন সেদিন বাংলা ভাষার জন্যে। আবু ছাঈদ সেদিন এ স্কুলেরই শিক্ষার্থী ছিলেন। মেধাবী- বরাবর ফার্স্ট বয়ই ছিলেন।

আটচল্লিশের ২৮শে ফেব্রুয়ারি স্কুলের বন্ধুদের এবং গ্রামের তরুণ-যুবকদের একত্রিত করে মিছিল বের করেন তিনি। পুরো ইউনিয়ন ঘুরে সেই মিছিল নিয়ে। তারপর থানা সদরে যায় সেই মিছিল। বিশাল সেই মিছিল। ভাষার দাবিতে প্রত্যন্ত গ্রামেও মিছিল হয়েছিল। পরদিনই মুসলিম লীগ নেতা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হাসান আলী হেডমাস্টারের রুমে ডেকে আনেন আবু ছাঈদকে। রাষ্ট্রবিরোধী এমন মিছিল করার জন্য কৈফিয়ত চান। অবশেষে হেডমাস্টার ও চেয়ারম্যান মিলে আবু ছাঈদকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করেন।

আবু ছাঈদের আর দেওয়া হলো না ম্যাট্রিক পরীক্ষা।

সে কষ্টের বহ্নিশিখা আজও জ্বলছে আবু ছাঈদের মনে। আজ তাঁর নিজের সেই স্কুলের মনোরম সুশোভিত দালানের উদ্‌বোধন হচ্ছে। প্রাক্তন ছাত্র আর নির্যাতিত ভাষা সৈনিক আবু ছাঈদ মো. আবদুল্লাহই এর উদ্‌বোধন করছেন। উদ্‌বোধন করার মতো সম্মান পেয়ে আবেগে কেঁদে দিয়ে বলেন– এ শ্বেতপাথরই আমার ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট।

চমকে গেল সবাই, চমকে গেলেন এমপি সাহেবও। শুধু চমকালেনই না, একটি লুকানো সত্যকে জেনে শ্রদ্ধা জানালেন আবু ছাঈদ মো. আবদুল্লাহকে।

শেকড়ের এমন সন্ধানে সামিউলের আগ্রহটা খুবই বেশি। তাতে নেই ক্লান্তি। এমন সব মহৎ কাজে কোনোদিনই আত্মপ্রচারে গা ভাসাননি তিনি। নাম প্রচার-প্রসার করেননি। কিন্তু এ বাড়িটাকে এখন

কেমন যেন আত্মপ্রচার বলেই মনে হচ্ছে!

এমন চমৎকার বাড়িটি তবে কি নীরবে আত্মপ্রচার?

নাকিব ভাবে, সত্যি কি উনি আত্মপ্রচার করছেন? কিন্তু মনে তো হয় বাড়িটা ভিন্ন একটা বিমূর্ত অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

বিকেলে আসে ওরা তিনজন। নাকিব বলে, চল সামিউল চাচার কাছে যাই। তাকে জানাই আমার চিন্তাটা। দেখি ঠিক হয় কিনা।

ওরা যায় সামিউলের সেই সুন্দর বাড়িটিতে।

তিনি বসতে দেন ওদের।

কুশলাদি জানার পর নাকিব বলে, চাচা একটা কথা বলতে চাই।

–একটা কেন? বলো, অনেক কথা বলো।

–চাচা আপনার এ বাড়িটার ডিজাইনটা কি শুধুই বাড়ি? আমার কাছে অন্য কিছু মনে হচ্ছে।

একটু চমকে যান তিনি, আবার কৌতূহলীও হন সামিউল। কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, বলো– কী মনে হচ্ছে তোমার?

–চাচা আপনার বাড়িটি বাংলা বর্ণ 'ব' এর সাথে 'আকার' অর্থাৎ 'বা' ডিজাইনের বিমূর্ত একটা অবয়ব। এর অর্থ বাংলা ভাষা, আবার বাংলাদেশ। দুটোই বুঝানো হয়েছে।

অট্টহাসিতে দাঁড়িয়ে যান সামিউল হক। তারপর এগিয়ে গিয়ে নাকিবকে জড়িয়ে ধরে বলেন, এটাই আমার তোমার শেকড়। ■

লেখক: গল্পকার ও প্রাবন্ধিক

মাইশা বিনতে মাহমুদ, ৭ম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মিরপুর-১২

বাক্যের বর্গ

তারিক মনজুর

নতুন ব্যাকরণ বইয়ে অনেক কিছুই আর আগের মতো নেই। বাক্যের অধ্যায়ে লেখা রয়েছে 'বাক্যের বর্গ'। নেহা বেশ অবাক হয়। বাক্যের আবার বর্গ হয় নাকি? সে ভাষা-দাদুকে ফোন করল। বলল, 'দাদু, বাক্যের বর্গ মানে কী?'

দাদু ফোনের ওপাশ থেকে বললেন, 'বাক্যের বর্গের কথা তো আগে শুনিনি! এটা কোথায় পেলে?'

'দাদু, আমাদের নতুন ব্যাকরণ বইয়ে আছে।'

'মজার ব্যাপার! আচ্ছা বইটা আমাকে দেখাতে পারবে?'

'কেন পারব না?' নেহা বলে, 'এক্ষুণি বইটা আমি তোমার কাছে নিয়ে আসছি।'

তখন বিকাল। ভাষা-দাদু হাঁটতে বের হবেন। বললেন, 'এখন তো আমার হাঁটার সময়। বইটা নিয়ে তুমি মাঠে যাও। আমি নদীর ধার দিয়ে হাঁটা শেষ করে আসছি।'

নেহা ব্যাকরণ বই নিয়ে মাঠে গেল। ওখানে সব ছেলে-মেয়ে ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে খেলছে। নেহাকে দেখে বিনু এগিয়ে আসে। বলে, 'কী রে! খেলতে এসেছিস হাতে বই নিয়ে?'

ততক্ষণে পিলটুও চলে এসেছে বিনুর পাশে। বলল, 'শুধু বই না, হাতে খবরের কাগজও দেখছি! কিন্তু ব্যাপার কী?'

ব্যাপার কী নেহা পরিষ্কার করল। বলল, 'খানিক বাদে ভাষা-দাদু এখানে আসবেন। তিনি বাক্যের বর্গ বোঝাবেন।'

'বাক্যের বর্গ?' বিনুও অবাক হয়, 'বাক্যের আবার বর্গ হয় নাকি?'

'কী জানি বাপু!' পিলটু বলে, 'আমি তো জানি, যে চতুর্ভুজের চারটি বাহুই সমান, তাকে বর্গ বলে।'

'ওটা তো জ্যামিতিতে আছে।' নেহা বলে, 'কিন্তু এই ব্যাকরণ বইয়ে লেখা রয়েছে বাক্যের বর্গ।'

'কই, দেখি দেখি!' বিনু আর পিলটু একসঙ্গে বইয়ের দিকে তাকায়। নেহা ব্যাকরণ বই খুলে দুজনকে দেখালো। একটা পরিচ্ছেদের নাম 'বাক্যের বর্গ'।

সেদিন বিকালে ওদের আর খেলা হলো না। অপেক্ষা করতে লাগল, কখন ভাষা-দাদু আসবেন। বাক্যের বর্গ ওদের কাছে রহস্যময় ধাঁধা মনে হচ্ছে। খানিক বাদে ভাষা-দাদু এলেন। ততক্ষণে খবরের কাগজ বিছিয়ে ওরা বসে পড়েছে। ভাষা-দাদুও হাতের

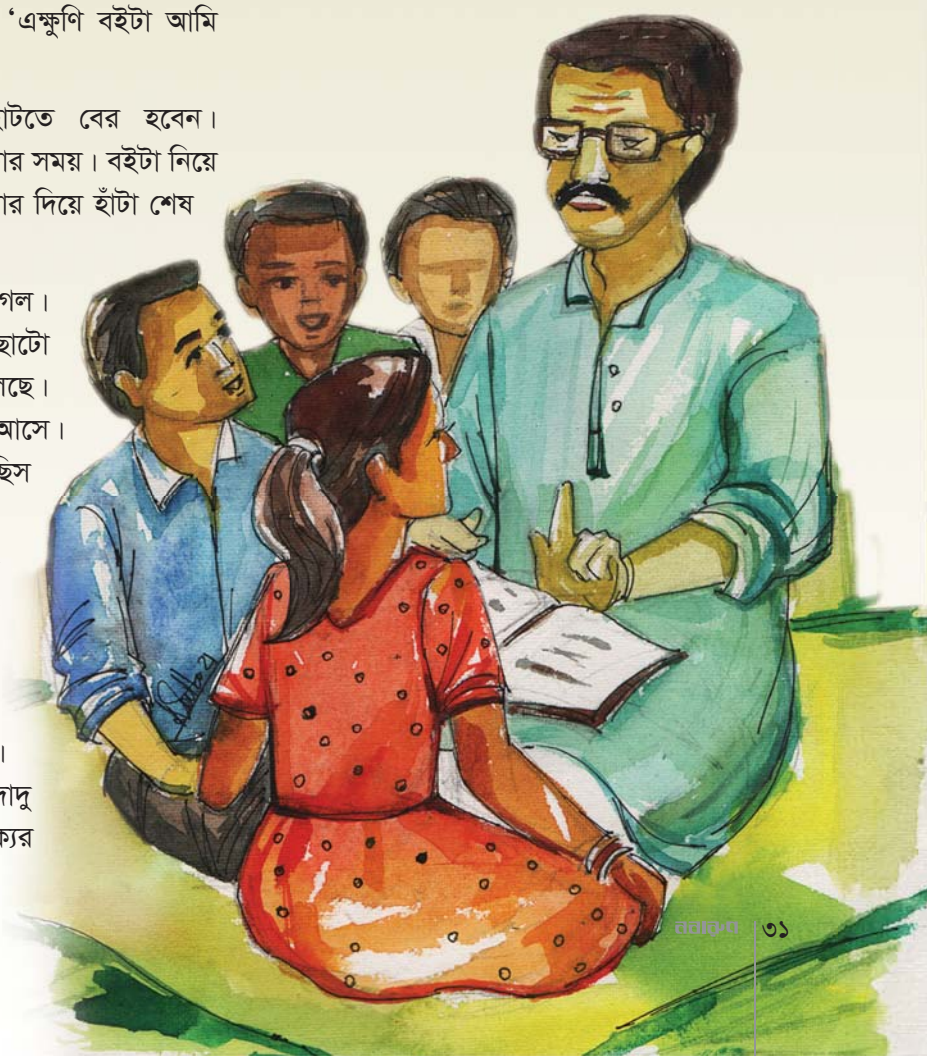

লাঠি রেখে ওদের সঙ্গে বসে পড়লেন। বললেন, 'তারপর কী অবস্থা সবার?'

বিনু বলল, 'আমাদের অবস্থা পরে শুনো। আগে বাক্যের বর্গ কী, সেটা বুঝিয়ে দাও।'

ভাষা-দাদু ব্যাকরণ বইটা হাতে নিলেন। বললেন, 'আগে আমাকে দেখতে দাও। এমন কথা আমিও এই প্রথম শুনলাম।'

বাক্যের বর্গের কথা ভাষা-দাদুও প্রথম শুনলেন! ভাষার এমন কিছু নেই, যা ভাষা-দাদু জানেন না। পিলটু বলে, 'কিন্তু দাদু, তুমি তো বাংলা ভাষার সবকিছুই জানো।'

দাদু কথা না বাড়িয়ে 'বাক্যের বর্গ' নামের পরিচ্ছেদটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন। একটু পরে বললেন, 'ও, এই ব্যাপার! বুঝেছি।'

'কী বুঝেছ? কী বুঝেছ?' বিনু আর পিলটু একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে।

ভাষা-দাদু এবার বই বন্ধ করে ওদের দিকে তাকালেন। বললেন, 'বাক্যের মধ্যে অনেকগুলো শব্দ থাকে। তাই তো?'

নেহা বলল, 'এক বা একাধিক শব্দ মিলে যখন মনের ভাব প্রকাশ করে, তখন তাকে বাক্য বলে।'

'বেশ।' ভাষা-দাদু বলতে থাকেন, 'বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলো আবার গুচ্ছ আকারে থাকে। বর্গ হলো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত শব্দের গুচ্ছ।'

'দাদু একটু সহজ করে বলো।' বিনুর কাছে পুরো ব্যাপারটা বিদঘুটে লাগছে।

'উদাহরণ দিয়ে বললে বুঝতে পারবে। মনে করো, একটা বাক্য এ রকম – পাখিটা উড়ে গেল। এখানে 'পাখিটা' একক শব্দ হিসেবে আছে। কিন্তু যদি বলি, নীল রঙের পাখিটা উড়ে গেল। তাহলে 'নীল রঙের পাখিটা' কয়েকটি শব্দের গুচ্ছ তৈরি করেছে।'

'দাদু, আরো উদাহরণ দাও।' নেহা বলে।

'দিচ্ছি।' ভাষা-দাদু বলতে থাকেন, 'হাতি ফসল নষ্ট করেছে। এখানে 'হাতি' একক শব্দ হিসেবে আছে। আবার, একদল বুনো হাতি ফসল নষ্ট করেছে। এখানে 'একদল বুনো হাতি' গুচ্ছ আকারে আছে। শব্দের এ রকম গুচ্ছকে বর্গ বলে।'

'কিন্তু দাদু, আমরা তো জানি, যে চতুর্ভুজের চারটি বাহু পরস্পর সমান, তাকে বর্গ বলে।'

ভাষা-দাদু হা হা করে হাসতে থাকেন, 'জ্যামিতিতেও রকমই আছে বটে। কিন্তু ব্যাকরণে বর্গ অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জ্যামিতির বর্গকে ইংরেজিতে বলে স্কয়ার। আর ব্যাকরণের বর্গকে ইংরেজিতে বলতে হবে গ্রুপ। বর্গ মানে এখানে গুচ্ছ বা দল'।

'তাহলে, দাদু,' বিনু জিজ্ঞেস করে, 'মাঠের মধ্যে ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে সবাই খেলছে। এদেরকে আমরা বর্গ বলতে পারব?'

'অবশ্যই পারবে।'

নেহা বলে, 'দাদু, বইয়ে বাক্যের বর্গের আবার প্রকারভেদ দেখানো আছে।'

দাদু বলেন, 'প্রকারভেদে চার রকম দেখানো হয়েছে। একটি বর্গ বাক্যের মধ্যে যে পদের মতো আচরণ করে, সেই পদের নাম অনুযায়ী বর্গের নাম হয়।' এই বলে ভাষা-দাদু বই খুলে দেখান:

বিশেষ্য বর্গ: অসুস্থ ছেলেটি আজ স্কুলে আসেনি।
আমার ভাই পড়তে বসেছে।
বিশেষণ বর্গ: আমটা দেখতে ভারি সুন্দর।
ভদ্রলোক সত্যিকারে নির্লোভ।
ক্রিয়া বিশেষণ-বর্গ: সকাল আটটার সময়ে সে রওনা হলো।
তারপর আমরা দশ নম্বর প্লাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালাম।
ক্রিয়া বর্গ: অস্ত্রসহ সৈন্যদল এগিয়ে চলেছে।
সে লিখছে আর হাসছে।

এরপর ব্যাখ্যা করে বলেন, 'বিশেষ্যর আগে বিশেষণ আর সম্বন্ধপদ যুক্ত হয়ে বিশেষ্যবর্গ তৈরি হয়। আবার বিশেষণ জাতীয় শব্দের গুচ্ছকে বলে বিশেষণবর্গ। যে শব্দগুচ্ছ ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে কাজ করে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ-বর্গ বলে। আর বাক্যের ক্রিয়া প্রায়

ক্ষেত্রে ক্রিয়া বর্গ তৈরি করে।'

'সহজ কথায় বর্গ হলো শব্দের গুচ্ছ। তাই না, দাদু?' বিনু বলে।

'হ্যাঁ, তাই।' ভাষা-দাদু মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দেন।

'আর বর্গ বা শব্দগুচ্ছ যে পদের মতো আচরণ করে, সেই অনুযায়ী বর্গের নাম হয়। তাই না, দাদু?' পিলটু বলে।

'হ্যাঁ, ঠিক বুঝেছ।' ভাষা-দাদু পিলটুর দিকে তাকান।

ততক্ষণে সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। বাড়ি যেতে হবে। বিনু বলল, 'দেখো দেখো দাদু, সূর্যটাকে মনে হচ্ছে যেন ডিমের লাল কুসুম।'

ভাষা-দাদু হেসে বললেন, 'এখানে 'ডিমের লাল কুসুম' হলো শব্দের গুচ্ছ বা বর্গ।'

'আর এটা সূর্যের বিশেষণ হিসেবে কাজ করছে। তাই 'ডিমের লাল কুসুম' হলো বিশেষণ বর্গ। তাই না, দাদু?' নেহা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভাষা-দাদুর দিকে তাকায়।

'হ্যাঁ, তাই!' তারপর ভাষা-দাদু লাঠি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'মানুষ কথা বলতে গিয়ে শব্দের পরে শব্দ না বসিয়ে প্রায়ই বর্গের পরে বর্গ বসায়।' ■

লেখক: শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

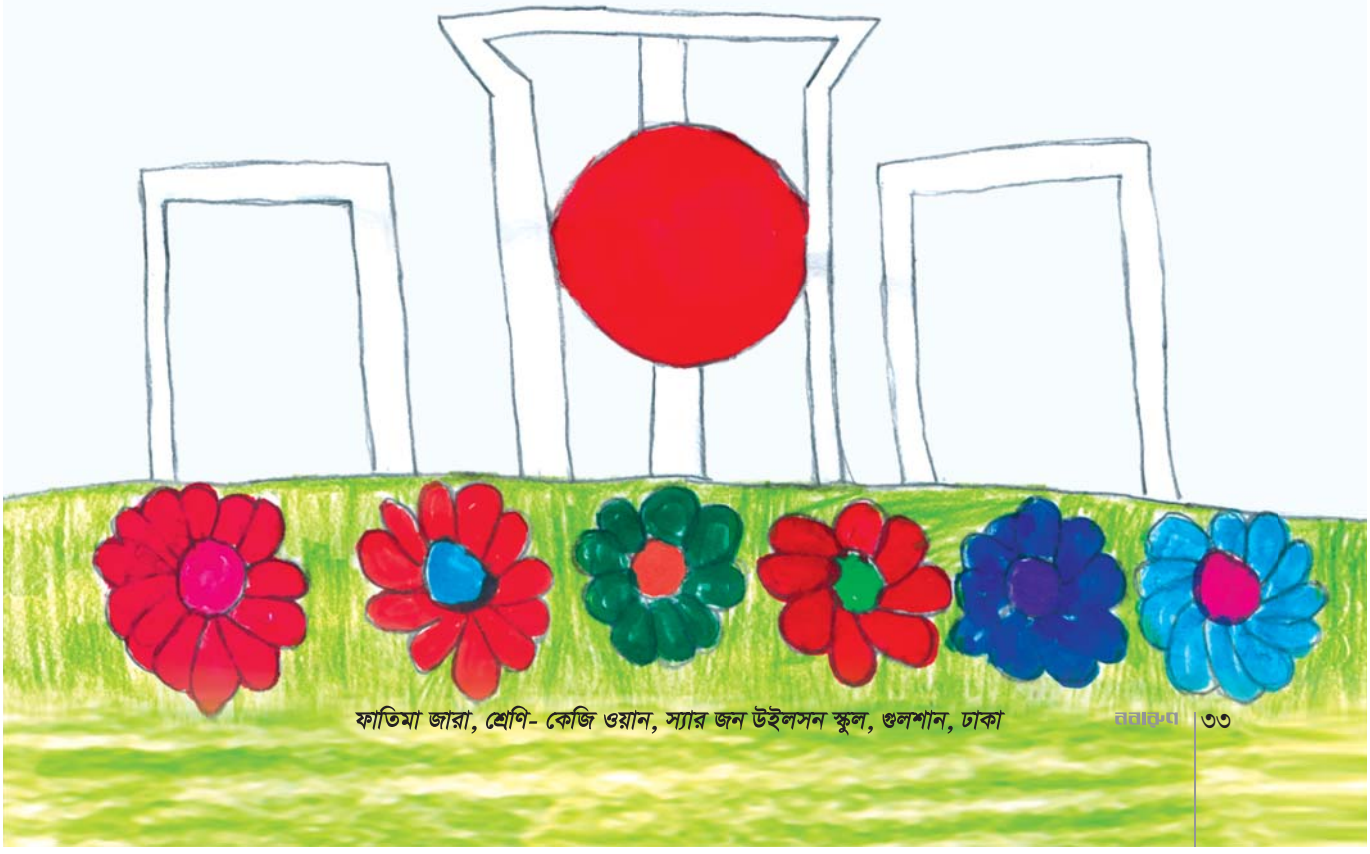

ফাতিমা জারা, শ্রেণি- কেজি ওয়ান, স্যার জন উইলসন স্কুল, গুলশান, ঢাকা

রম্য
গল্প

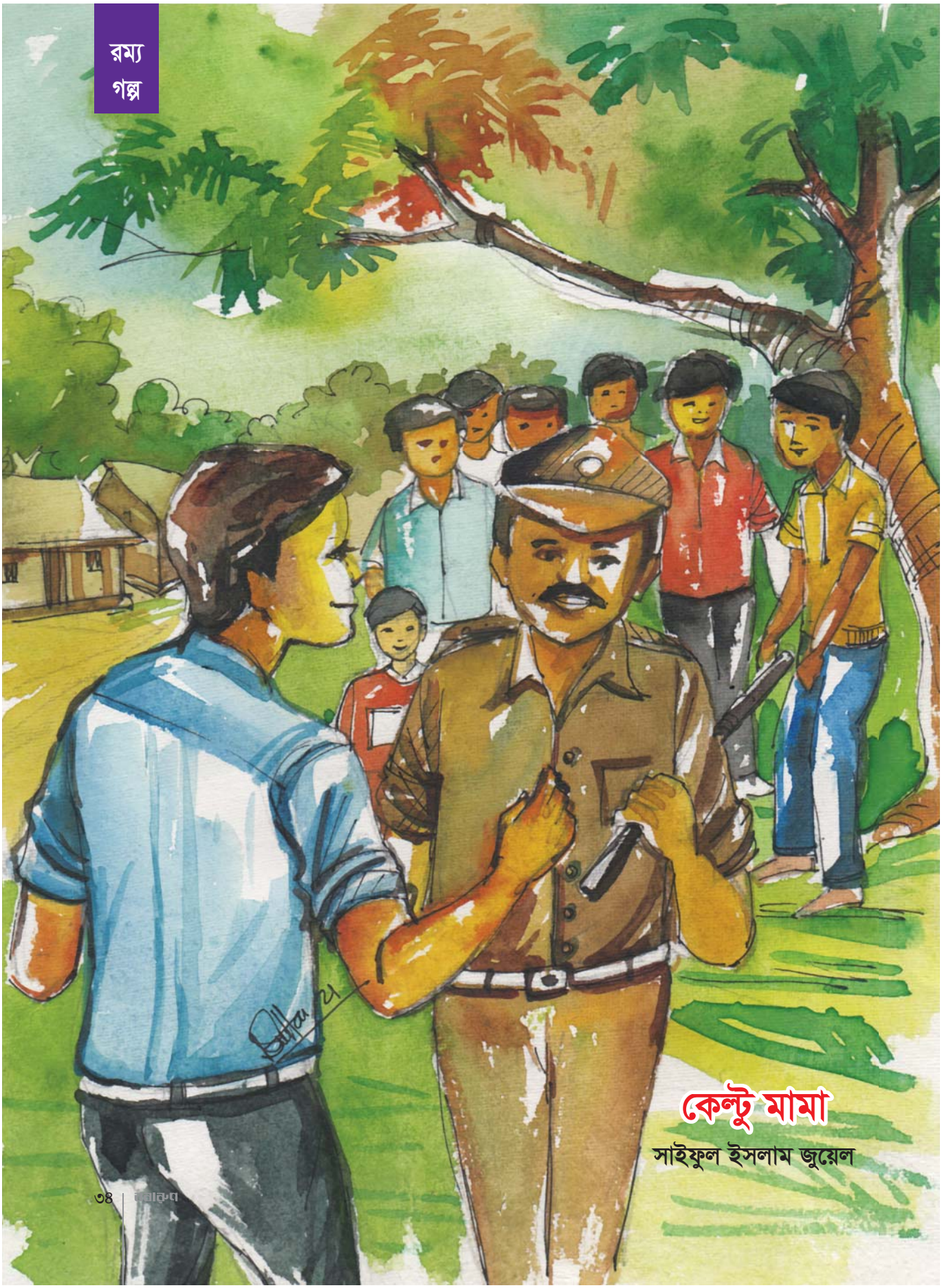

কেল্টু মামা

সাইফুল ইসলাম জুয়েল

‘বল, গুপ্তধন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস?’ ডাকাত সর্দারের হুংকার।

ভয়ে আমরা জড়োসড়ো হয়ে আছি। তবে বেশি খারাপ অবস্থা আমাদের ছোটো মামার। তার হাত-পা কাঁপছে। দাঁতে দাঁত ঠেকে শব্দ হওয়ার আওয়াজও কানে আসছে।

ডাকাত সর্দারের হম্বিতম্বির থেকেও ছোটো মামার বোকামো দেখে আমরা একটু বেশিই অবাক হচ্ছি। বাড়িতে যে-কোনো গুপ্তধনই নেই– এ কথাটা তিনি তাদেরকে বলে দিলেই তো পারেন।

‘মটকা দুটো কই?’ ডাকাত সর্দার আবারও গর্জে উঠলেন। ‘তাড়াতাড়ি বল, নাহলে সবকটাকে শেষ করে ফেলব।’

শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। ভয়ে মিরাজ ভাইয়া আমাদের স্টোররুমটা দেখিয়ে দিলো, ‘ওই ঘরে।’

‘ও ঘরে তো ইয়া বড়ো সাইজের তালা ঝুলিয়ে রেখেছিস! চাবি কার কাছে?’

মিরাজ ভাইয়া এবার ছোটো মামার দিকে ইঙ্গিত করল।

ডাকার সর্দার ছোটো মামার দিকে হাত বাড়ালেন। ‘চাবিটা দে।’

যদিও মামার তখন ত্রাহিত্রাহি অবস্থা, তবুও তিনি নাছোড়বান্দার মতো বললেন, ‘চাবি নেই।’

‘চাবি নেই মানে! গিলে খেয়েছিস? তাহলে তোকেও কিন্তু আমি চাবিয়ে খাবো!’

মামা কোনোমতে বলল, ‘ইয়ে, মানে... হারিয়ে ফেলেছি!’

‘কী জ্বালা! এখন দেখছি ডাকাতি করার সময় চাবিওয়ালাকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হবে!’ ডাকাত সর্দার মহাবিরক্ত। ‘এই, তাড়াতাড়ি ওই তালাটা ভাঙার ব্যবস্থা কর তো।’ চ্যালাদের হুকুম দিলেন তিনি।

আমি ভেবে পাই না, চাবি নিয়ে ছোটো মামার এমন মিথ্যাচারের কী দরকার ছিল। তাকে সার্চ করলেই কিন্তু পকেট থেকে সুরসুর করে চাবিখানা বেরিয়ে আসবে। তখন ডাকাতরা তার কী অবস্থা করবে একবার ভেবে দেখেছে!

আর সামান্য দুটো মটকার জন্য মামা এমন কেন করছেন!

ঘটনার শুরু আজ সকালে। আমাদের ছোটো মামা হঠাৎ বাড়ির সামনের খালি জমিটা খুঁড়তে শুরু করলেন। তিনি নাকি ওখানে ফসল ফলাবেন। সর্বমহলে ফেল্টু-কেল্টু নামে সুপরিচিত আমাদের ছোটো মামা বুঝিয়ে দিতে চান– চাইলে তিনিও কিছু করে দেখাতে পারেন!

তার এই কেঁচো তথা জমি খুঁড়তে গিয়ে মাটির তলা থেকে দু-দুটো সাপ, আইমিন মটকা বেরিয়ে এল। ‘গুপ্তধন’ খুঁজে পাওয়ায় মামার তখন সে–কী উত্তেজনা। উপরে ঢাকনা, তার নিচে মাটি। মাটির আড়ালে মটকা দুটোর নিচে মামার পূর্বপুরুষদের যাবতীয় ধনসম্পদ সঞ্চিত আছে।

বাড়ির চারপাশে দেয়াল থাকায় বাইরের লোকজন এর কিছুই টের পেল না। তবে, ছোটো মামা খাল কেটে সেই কুমির ডেকে আনার কাজটা ভালোভাবেই করলেন। মানে, মটকা দুটোকে মাটির নিচ থেকে তোলার আগেই তিনি ওগুলোর ছবি তুলে ফেসবুকে দিয়ে দিলেন।

একটু পরেই মট মট করে মটকা দুটো গেল ভেঙে। আস্তে আস্তে সমস্ত মাটি সরিয়ে ফেলার পরেও যখন মাটি ব্যতীত আর কিচ্ছুটি মিলল না, তখন ছোটো মামার মাথা চাপড়ানোর দশা হলো।

ওদিকে, ফেসবুকের স্ট্যাটাসের কারণে গুপ্তধনের খবর ততক্ষণে পুরো এলাকায় চাউর। লোকজন দলে দলে গুপ্তধন দেখার জন্য আমাদের বাড়ির গেটে এসে জড়ো হতে লাগল।

ছোটো মামা দ্রুত ভাঙা মটকা দুটোকে পুনরায় মাটিচাপা দিলেন। তারপর, সবার সামনে গিয়ে সগৌরবে ঘোষণা দিলেন, ‘বীর বাহাদুরের বাড়িতে তার পূর্বপুরুষদের দু-খানা মটকা ভর্তি গুপ্তধন পাওয়া গিয়েছে!’

‘এই বীর বাহাদুরটা কে?’

গুপ্তধনের বদলে লোকজনের এমন প্রশ্ন শুনে ছোটো মামা তো থ’। তিনি কোনোমতে ঢোক গিলে বললেন, ‘ইয়ে মানে... আমিই।’

‘তা, তুমি কী এমন বীর বা বাহাদুরি কাজটা করলে? বরং তোমার কৃতকর্মের জন্যই তো তোমার বাহাদুর নামটা ফেল্টুতে বদলে গেল!’

অপমান হজম করে মামা ফের বললেন, ‘আমি শুধু

নামেই বাহাদুর নই, কাজেও বাহাদুর। আর আমি বীর বাহাদুর বলেই আমার পূর্বপুরুষদের কাড়ি কাড়ি সম্পত্তির হদিস পেলাম।'

লোকজন গুপ্তধন দেখতে চাইলে মামা রাজি হলেন না। তার সাফ কথা, 'ওগুলো আমাদের স্টোররুমে রাখা হয়েছে। কাউকে দেখানো যাবে না।'

লোকজন তখন গুপ্তধন দেখার জন্য মরিয়া। তারা মামাকে হুমকি পর্যন্ত দিলো, 'তাহলে আমরাও দেখব– ওই গুপ্তধন থাকে কী করে! হাপিস করে দেবো!'

মামাও কম যান না। তিনিও গলা চড়িয়ে বললেন, 'যে বাড়িতে বীর বাহাদুর আছে, সে বাড়িতে তস্কর পা রাখার আগে একশ'বার ভাববে।'

সন্ধ্যার পর পরই মামা গোপনে দুটি মটকা কিনে আনলেন। মাটির সাথে পানি মিশিয়ে নরম কাদা বানিয়ে মটকাগুলোর গায়ে লেপে দিলেন। অর্থাৎ কিছুটা পুরোনো রূপ দিলেন ওগুলোকে। যাতে কেউ দেখলে ভাবে– ওগুলোই এতকাল মাটির নিচে চাপা পড়ে ছিল। অতঃপর, মটকা দুটোকে তিনি যত্ন সহকারে স্টোররুমে রেখে দিলেন।

রাতেই আমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়ল। আমাদের বীর বাহাদুর মামার তখন কাঁপতে কাঁপতে মূর্ছা যাবার দশা। তার থেকে চাবি না পেয়ে ডাকাতরা যখন স্টোররুমের তালা ভাঙতে শুরু করল, তখন বাইরে পাহারারত ডাকাত দলের এক সদস্য এসে জানাল, 'পুলিশ এসে পড়েছে। ভাগো!'

ডাকাত দল তখন পড়িমরি করে ছুটে পালালো।

বাইরে কিছুক্ষণ চিৎকার চেঁচামেচির পর পুলিশ ইনস্পেকটর এসে জানালেন, 'সবগুলো ডাকাতই পুলিশের জালে ধরা পড়েছে! শাবাশ, বীর বাহাদুর!'

অমনি আমাদের ছোটো মামার বুকের ছাতি ছয় ইঞ্চি ফুলে গেল!

পরে শুনলাম, এর পেছনে আসল কলকাঠি নেড়েছেন আমাদের নানাভাই। তিনিই থানায় গিয়ে পুলিশকে কেল্টু থুড়ি বীর বাহাদুর মামার মিথ্যে গুপ্তধন পাওয়ার খবরটা জানান। শুধু তাই নয়, তার কেন জানি সন্দেহ হয়েছিল– গুপ্তধনের লোভে আজ রাতেই ডাকাত দল আমাদের বাড়িতে হামলে পড়তে পারে!

নানাজানের কীর্তিতে ছোটো মামা প্রশংসা পেলেও, গর্বে তার বুক ফুলে গেলেও, মামাকে কেন জানি খুব

চিন্তিত মনে হলো। পুলিশ চলে গেলে তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'বড়ো বাঁচা বেঁচে গেলাম রে...।'

'সে তো সবাই-ই।'

'ভাগ্যিস স্টোররুম খোলার আগেই পুলিশ এসেছিল।'

আমরা অবাক। খালি মটকার ভেতর ডাকাতরা কী এমন পেত! আর তা না পাওয়াতে মামাই বা এমন খুশি হচ্ছেন কেন!

পরদিন মামা মটকা দুটোর ভেতর কিছু অলংকারাদি রাখলেন।

'এগুলো কী হলো?' আমাদের এই প্রশ্নের জবাবে মামা জানালেন, 'বীর বাহাদুরের বাড়িতে চোর-ডাকাত এসে যদি দেখে কোনো গুপ্তধনই নেই, তাহলে তারা ধরেই নেবে– আমাদের পূর্বপুরুষদের কিছুই ছিল না। সে কি এক লজ্জার কথাই না হবে, তোরাই বল। ভাগ্যিস স্টোররুমে ইয়া বড়ো তালা মেরে রেখেছিলাম। ডাকাতরা কাল তালা খুলে মটকাগুলো দেখার সময়টা পায়নি! তার আগেই পুলিশ এসে পড়ল।'

এলাকায় সত্বর বীর বাহাদুরের নাম ছড়িয়ে পড়ল। তবে আমাদের ভয় দূর হলো না। আজ না হয় পুলিশ বাংলা সিনেমার মতো শেষ সময়ে না এসে, উলটো রাইট টাইমে এসে পড়েছে! কিন্তু যে বাড়িতে এমন ভীতু বীর বাহাদুর আছে, তাদের তো প্রতি রাতে রাতে বিপদ!

এই 'রাতে রাতে বিপদ' বলার কারণ হলো– যে রাতে ডাকাত পড়ল, ঠিক তার পরের রাতেই বাড়িতে চোরও ঢুকল!

আমাদের বাড়িতে এক 'পাউডারম্যান' মজুদ রয়েছে, মামার ছোটো ভাগিনা রাফিন। চার বছর বয়সি এই পিচ্চিটার কাজই হলো পাউডার নিয়ে খেলা করা। এদিন রাতে সে গো ধরেছে– আগের দিন ছোটো মামা কাদা-মাটি দিয়ে খেলা করেছে, আজ মামাকে তার সাথে পাউডার নিয়ে খেলতে হবে। রাজি না হলে সে কেঁদে-কেটে পুরো বাড়ি মাথায় তুলবে। বলা বাহুল্য, রাফিন তার ছোটো মামাকে পাউডার দিয়ে গোসল করিয়ে ছাড়ল। তখন হঠাৎ কেউ বাড়ির মেইন সুইচ অফ করে দিলো। পুরো বাড়ি গেল অন্ধকারে ডুবে। ঠিক তখন আমরা এক চোরকে দেখতে পেলাম। অন্ধকারেও তার হাতে ধরে রাখা ছোরাটা চকচক করছে। তাকে দেখা মাত্রই আমাদের বীর বাহাদুর ছোটো মামার হাত-পা তথা পুরো শরীর থরথর করে কাঁপতে শুরু করল।

তখনই ঘটল এক অদ্ভুতুড়ে ঘটনা।

'ভূত ভূত' বলে চিৎকার দিয়ে উঠে চোর মহাশয় পড়িমরি করে ছুটে পালালো। সবকিছু ভালো করে দেখে বুঝলাম– মামাকে রাফিনের পাউডার দিয়ে গোসল করানোয় ভালো উপকারই হয়েছে। একে তো অন্ধকারে সাদা ভূতের মতো দেখাচ্ছিল মামাকে, তার ওপরে ওভাবে কাঁপাকাঁপি করাতে মনে হচ্ছিল– তিনি যেন বাতাসে ভাসছেন! অন্ধকারে এমন কিছু দেখলে যে কারোরই ভয় লাগার কথা!

বীর বাহাদুরদের বাড়িতে চকচকে ছুরি হাতে চোর ঢোকা এবং তার ওভাবে ভেগে যাওয়ার কথা রাষ্ট্র হতে সময় লাগল না। তবে, আমরা তো জানি– এভাবে বেশি দিন বীর বাহাদুরের খুঁজে পাওয়া 'গুপ্তধন' পাহারা দিয়ে রক্ষা করা সম্ভব নয়! মামা যা ভীতুর ডিম! কেল্টু-ফেল্টুর পরে তার এই বিশেষ 'কাঁপাকাঁপি' গুণটির জন্যে না জানি তাকে নতুন কী নামে অভিহিত করা হয়!

পরদিন মামা দুটো অ্যালসেশিয়ান কুকুর কিনে আনলেন। দিনরাত ভুলে বেশ খাটুনির পরে ওগুলোকে প্রশিক্ষিত করে তুললেন তিনি।

এলাকার জোয়ান-বুড়ো সবাই এখন আমাদের বাড়ির লোকজনকে বেশ সমীহ করে চলে। ছোটো মামার পালে হাওয়া লেগেছে। কেউ আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে গেলে হাত উঁচিয়ে বলে, 'ওটা বীর বাহাদুরদের বাড়ি! ও বাড়িতে দু-দুটি মটকা ভর্তি গুপ্তধন রয়েছে। সাবধান! ওর আশপাশ দিয়েও যেয়ো না। পুলিশ সাদা পোশাকে সর্বক্ষণ ওই গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে। কাছে গেলেই ঘাড়টা খপ করে চেপে ধরবে!'

মামার কথা শুনে আমরা মুখ চেপে হাসি।

এ বাড়িতে দুটো-মটকা ভর্তি গুপ্তধন আছে বটে! ছোটো মামা তার কিনে আনা মটকা দুটোতে একটু একটু করে অলংকারাদি জমাচ্ছেন; যদিও তার অধিকাংশই রূপো আর ইমিটিশনের!

আর এ বাড়িতে নকলের পাশাপাশি সত্যিকারের বীর বাহাদুরও আছে বটে! সেই দুটো অ্যালসেশিয়ান কুকুরের নামও যে বীর বাহাদুরই! ■

লেখক: গল্পকার ও প্রাবন্ধিক

গল্প

রুকু টুকুর গাছ বন্ধু

অদ্বৈত মারুত

রুকুর বন্ধু টুকু। দুজন সমবয়সি। গলায় গলায় ভাব। ঘুম থেকে উঠেই দুজন একসঙ্গে। সারা বাড়ি টইটই করে ঘুরে বেড়ায়। না, না, শুধু ঘুরে বেড়ায় না, আরো কিছু করে। একসঙ্গে খেলাধুলা করে, খায়-দায়, ঘুমায়। গোসলও করে দুজন একসঙ্গে।

রুকু ও টুকুর বন্ধু অনেক। শিফাত, রনি, বিলু, কুমু ছাড়াও বাড়ির আশপাশের গাছপালা, লতাপাতা, ফলমূল, শাকসবজি, ফড়িং, প্রজাপতির সঙ্গেও ওদের দারুণ ভাব। নীল গাভির বাছুরটাও ওদের সঙ্গে খেলায় মেতে থাকে সব সময়। তাই ওদেরও বন্ধু মনে করে রুকু আর টুকু।

আজ টুকুর খুব মন খারাপ। আগে কখনো এমন হয়নি। ঘুম থেকে উঠে টুকু প্রথমে যায় কলপাড়ে। সেখানে অনেক গাছপালা, লতাপাতা। কলপাড়েই পেয়ারা গাছ। ওর সঙ্গেই প্রথম কথা হয় টুকুর। রুকুও তাই করে। ঘুম থেকে উঠে যায় কলপাড়ে। নানা জাতের ফুলে হাত বুলিয়ে তারপর দুই বন্ধু মিলে কথা বলে অন্যদের সঙ্গে।

কিন্তু টুকু আজ কলপাড়ে গেলে গাছে ঝুলে থাকা একটা পেয়ারা বলল–

রুকুর খবর জানো টুকু?

টুকুরও মনে হলো– আরে, তাই তো, রুকু কোথায়? ও কী এখনো ঘুম থেকে জাগা পায়নি? পেয়ারার সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে দৌড়ে ছুটে গেল রুকুদের বাড়ি। রুকু বিছানায় শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ। বার বার হাঁচি দিচ্ছে। কাশিও বেশ। নাক দিয়ে পানি পড়ছে। ওর বাবা-মা পাশে বসে আছেন। মাথায় পানি ঢালছেন। গা মুছে দিচ্ছেন। তারা খুব চিন্তিত। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছেন না।

টুকু বলল– কী হয়েছে রুকুর?

রুকুর মা বললেন– ওর তো জ্বর। সঙ্গে হাঁচি আর কাশি। সর্দিটা ভালোই লেগেছে। দেখো না গায়ে হাত দিয়ে, পুড়ে যাচ্ছে গা-টা।

'এখনই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে'– বললেন রুকুর বাবা।

রুকুর মা বললেন– দাঁড়াও। আরেকটু দেখি।

টুকু ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হাঁটতে হাঁটতে এল সবজি বাগানে।

টুকুকে দেখে মিষ্টিকুমড়া বলল– শুভ সকাল।

টুকুও বলল– শুভ সকাল বন্ধু।

মিষ্টিকুমড়া বলল– রুকু এল না? ওর নাকি জ্বর? বালতির কাছ থেকে শুনলাম।

গড়িয়ে যেতে যেতে পানিও বলল– কথা সত্য। রুকুর খুবই জ্বর।

'হ্যাঁ, গা-টা পুড়ে যাচ্ছে'– টুকু বলল মিষ্টিকুমড়াকে।

ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল একটা তুলসী গাছ। স্বর্ণলতা আড়াল করে রেখেছিল গাছটিকে। মিষ্টিকুমড়া আর টুকুর সব কথা শুনে তুলসী গাছের খুব মন খারাপ হলো। ডাকল টুকুকে। বলল– জ্বর কোনো অসুখ নয়। অন্য অসুখের লক্ষণ। যা-ই হোক, রুকুকে নিয়ে বেশি ভেবো না। ঠিক হয়ে যাবে। দেখো না, কি গরম পড়েছে! বেশি গরমে ঠান্ডা, জ্বর-সর্দি-কাশি লাগতে পারে। বেশি শীতেও এমন হয়। আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য এমন হয়। এ সময় তাই সাবধানে থাকতে হয়। তোমরা দুজন আবার ভীষণ দস্যি! সারাদিন দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটি করো। ঘেমে যাও।

বেশি ঘামলে শরীর থেকে লবণ বের হয়। লবণ বেশি বের হয়ে গেলে শরীরে দেখা দেয় পানি শূন্যতা। তোমরা তো আবার পানি পান করতেই চাও না। যা-ও বা পান করো, তা-ও আবার ঠান্ডা! এজন্য অসুখ বাধে।

একটু থামল তুলসী গাছটা। আবার বলা শুরু করল– টুকু, ভয় পেয়ো না। আমরা আছি না! 'দেখি বন্ধু রুকুর জন্য কী করা যায়'– বলেই তুলসী গাছ বলল– আমার গা থেকে আট-দশটি পাতা তুলে নাও। এগুলো ভালো করে ধুয়ে নেবে। পাতিলে পানি নিয়ে তার মধ্যে পাতাগুলো ছেড়ে দেবে। এরপর পাতিলটা দেবে চুলায়। আচ্ছামতো পানি ফুটিয়ে নিয়ে তা ঠান্ডা করবে। সেই পানি এক কাপ করে রুকুকে প্রতিদিন খাওয়াবে। দেখবে ও তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে আমাদের সঙ্গে আবার খেলছে।

টুকু তুলসী পাতা নিয়ে রুকুর মায়ের কাছে গেল। সব কথা খুলে বলল। রুকুর মা সেভাবেই কাজ করলেন। তিনি শুধু তুলসী পাতার সাহায্যই নিলেন না; রসুন, আদা, দারুচিনি, ধনে বীজকেও বললেন– তোমরা আমার মেয়েকে

ভালো করে দাও। ওরা রাজি হলো। রুকু তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে গেল।

রুকু, টুকু আবার খেলাধুলা শুরু করে দিলো। খেলতে খেলতে সবজি বাগানে এলে মিষ্টিকুমড়া বলল– এখন কেমন আছো রুকু?

'অনেক ভালো আছি'– বলল রুকু।

রুকু, টুকুর হাসিমাখা মুখ দেখে আনন্দে নেচে উঠল পেঁপে, বিট, মিষ্টি আলু, ওলকচু, তেলকুচা, করলা, মেথিশাক, নিমপাতা, হেলেঞ্চা শাক, কলার থোর, মোচা, ঢেঁড়স, ডুমুর, পালংশাক, ঝিঙে, গাজর, মটরশুঁটি, নটেশাক, পুদিনা, চিচিঙ্গা, পটল, কাঁকরোলসহ সবজি বাগানে আরো যারা ছিল সবার এক কথা– যদি ভালো থাকতে চাও, সুস্থ ও সবল থাকতে চাও, তাহলে বেশি বেশি শাকসবজি, ফলমূল ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার খাও।

নীল গাভিটা তখন ক্ষেতের আলে দূর্বাঘাস খাচ্ছিল। রুকুর অসুখের কথা সে শুনেছিল ফিঙের কাছে। যা-ই হোক, রুকু, টুকুকে দেখে লেজ দোলাতে দোলাতে গাভিটা ডাকল দুজনকে। বলল– আমার বুড়িটাকে দেখো, কেমন তরতাজা। তোমাদেরও বেশি বেশি দুধ পান করতে হবে। তবেই তোমাদের হাড় শক্ত হবে। দাঁত হবে মজবুত। মাংসপেশিও হবে সুন্দর। তোমাদের জন্যই তো আমি বেশি বেশি দূর্বা ঘাস খাই প্রতিদিন।

শাকসবজি, ফলমূল, গাভি সবাই একেক করে নিজেদের গুণের কথা জানালো রুকু, টুকুকে। ওরা সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এল পেয়ারা গাছতলায়।

টুকু বলল– ধন্যবাদ পেয়ারা। রুকুর অসুখের কথা তুমিই তো আমাকে জানিয়েছিলে।

পেয়ারাগুলো খুব খুশি হলো দুজনকে একসঙ্গে দেখে। পেয়ারা গাছটিও খুশি হলো। বলল– কতদিন তোমাদের পেয়ারা খাওয়াই না। দুজন দুটি পেয়ারা তুলে নাও। অনেক মিষ্টি এখন। জানোই তো, পেয়ারা ফলের অনেক গুণ। নিয়মিত পেয়ারা খেলে ত্বক ভালো থাকে। চোখ ভালো থাকে। তোমাদের শরীরের আরো কত উপকার করি আমরা! ওদেরও ধন্যবাদ জানিয়ে রুকু ও টুকু পেয়ারা খেতে খেতে আবার খেলায় মেতে উঠল। ■

লেখক: গল্পকার ও প্রাবন্ধিক

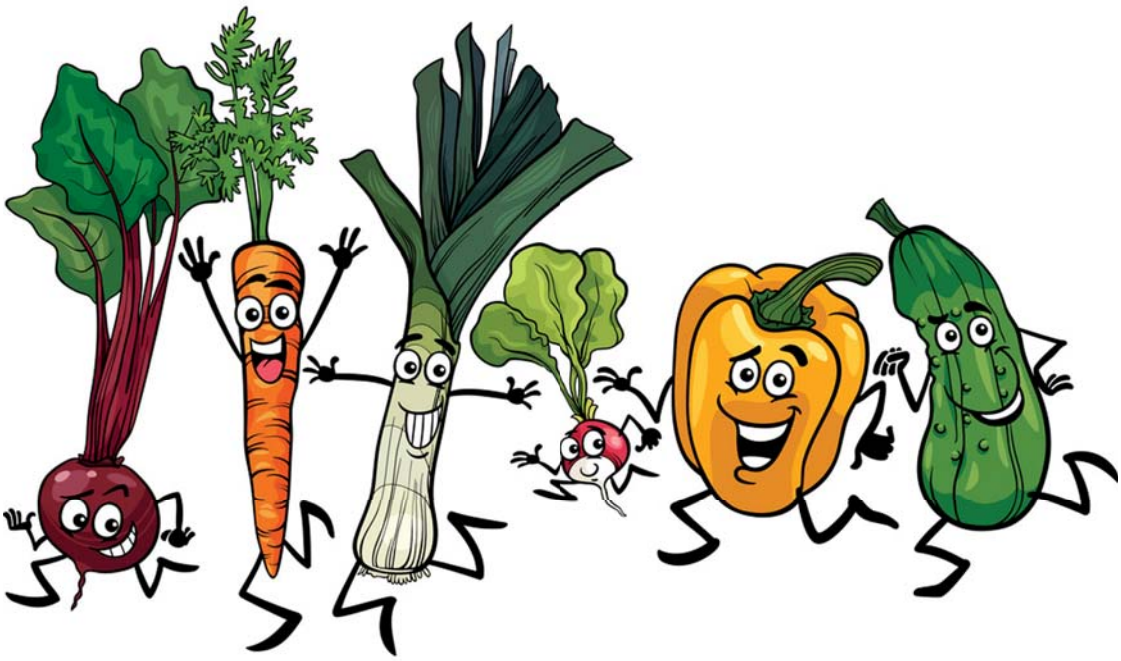

একুশের কবিতাগুচ্ছ

ভাষা

আবেদীন জনী

এই যে আমরা কথা বলি, হাসি, সুরে সুরে গাই গান
কত যে আদরে ডেকে বলে মা- কাছে আয় সোনা চান
চিঠির পাতায় কত কথা লিখি স্বজনের বরাবর
মায়ের ভাষায় ভাব বিনিময়ে ভরে যায় অন্তর।
ভাষা আমাদের দেয় কত কিছু– সে সব রাখি না খোঁজ
ভাষা থেকে আশা, ভাষা দেয় আলো জীবনের পথে রোজ।
মনের বাগানে জ্ঞানের কুসুম ভাষা-ই ফোটায় আগে
স্বপ্নের কচি সবুজ পাতারা ভাষার পরশে জাগে।
ভাষা না থাকলে কবিতা ও গান হতো না কখনো লেখা
কোথায় পেতাম শব্দ, ছন্দ, নিটোল সুরের দেখা?
ভাষাহীন এই পৃথিবীটা হতো নীরব নীরস মূক
ভাষা থেকে পাই বাঁচার সাহস, বুকে নেই ধুকপুক।
আমাদের ভাষা বাংলা ভাষাটা মায়ের কাছেই শেখা
ভাইয়ের রক্তে এই ভাষাটির ইতিহাস আছে লেখা।
পৃথিবীর বুকে চির অক্ষয় একুশে ফেব্রুয়ারি
ভুলব না কভু সন্তান হারা জননীর আহাজারি।
সে জাতি অধম, যে জাতির নেই নিজেদের কোনো ভাষা
ভাগ্যের ফুল ফোটে না তাদের, আহা কী সর্বনাশা !
ভাষার লড়াই একুশ থেকেই সাহসের সঞ্চয়
সেই সাহসেই বাংলা স্বাধীন, একাত্তরের জয়।
কারো বুকে সুখ, কারো বুকে থাকে দুঃখের নীল নদী।
কীভাবে এসব করত প্রকাশ ভাষা না থাকত যদি?
ভাষা আছে তাই কত সুখ পাই আমরা দিবস-যামী
ভাষা আমাদের গরবের ধন, জীবনের চেয়ে দামি।

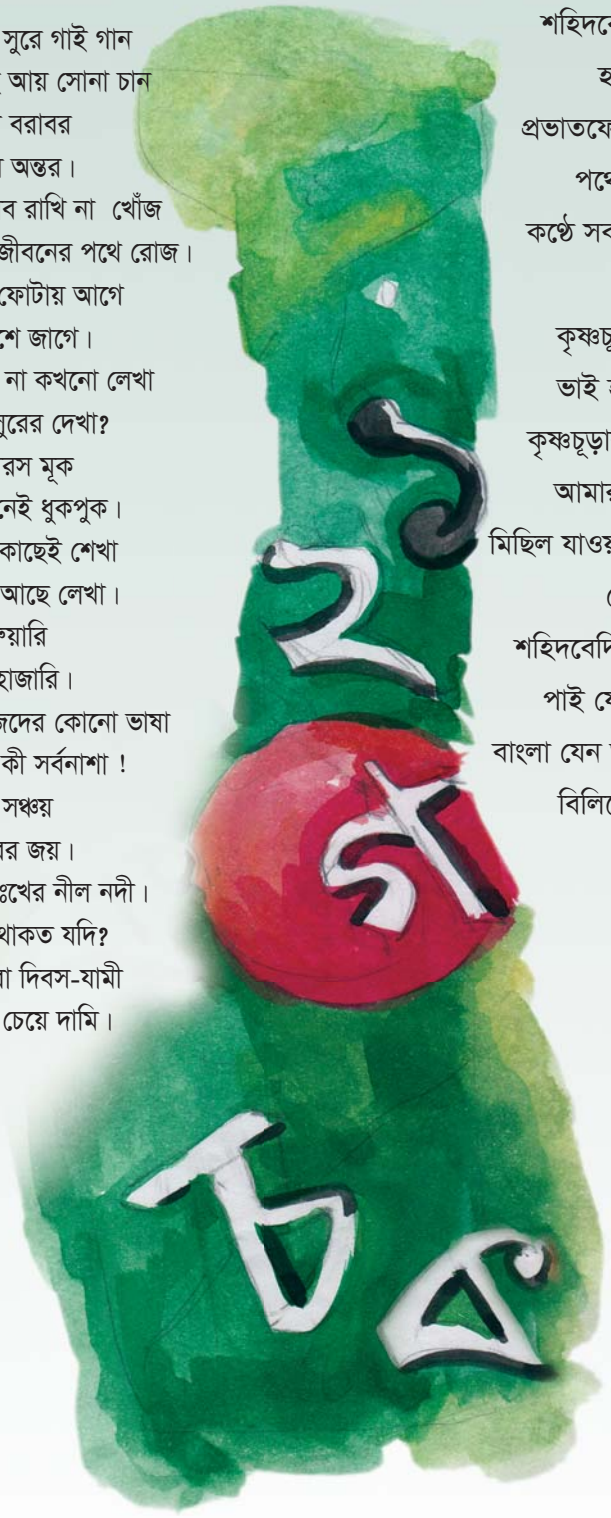

বিলিয়ে দেওয়া প্রাণ

হামীম রায়হান

শহিদবেদি ছেয়ে গেছে
হৃদয় রাঙা ফুলে,
প্রভাতফেরি এগিয়ে চলে
পথের ধুলো তুলে।
কণ্ঠে সবার ভাষার গান,
বর্ণমালা বুকে,
কৃষ্ণচূড়া লাল হয়েছে
ভাই হারানোর দুখে।
কৃষ্ণচূড়ার ফুলগুলো সব
আমার ভাইয়ের রক্ত,
মিছিল যাওয়া পথটা আজও
স্লোগানে উত্তপ্ত।
শহিদবেদির ফুলের মাঝে
পাই যে ভাইয়ের ঘ্রাণ,
বাংলা যেন আমার ভাইয়ের
বিলিয়ে দেওয়া প্রাণ!

বায়ান্নের বীজ বোনা

মোহাম্মদ আজহারুল হক

ইতিহাসে সুযোগ হলো
বায়ান্নে বীজ লাগানে
ছেষট্টিতে গাছটা হলো
সবার সেরা বাগানে।

উনসত্তরে গাছটায়
কোটি ফুল আসলো
সত্তরে ফুলের সুবাসে
সারা বাংলা ভাসল।

একাত্তরে সে গাছেই
টুকটুকে ফল ধরল
বায়ান্নের বীজ বোনা
সবই সার্থক করল।

বাংলা ভাষা

সুষমা ফাল্গুনী

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
বাংলা আমার গান।

বাংলা আমি ভালোবাসি
বাংলা আমার প্রাণ।

বাংলা ভাষায় কথা বলে
প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

অন্য ভাষা হৃদয় মাঝে
তৃপ্তি নাহি পায়।

বাংলা আমার জাতীয় ভাষা
রক্ত দিয়ে জয়।

ছিনিয়ে যারা আনলো ভাষা
তাঁরা হোক অক্ষয়।

বই

দেলওয়ার বিন রশিদ

মায়ের কাছে পথ চলার
সকল ছবক লই
মায়ের কাছে অ আ শিখি
শিখি পড়তে বই।

বই যেন মায়ের মতো
বিলায় জ্ঞানের আলো
বই ছড়ায় সত্য জ্যোতি
ঘুচায় মনের কালো।

বই পড়ে চিনে নিই
ভুল কিংবা ঠিক
বই পড়ে আমি হই
সাহসী ও নির্ভীক।

ভালো বই জীবন জুড়ে
স্নিগ্ধ ছায়া সুখ
বইয়ের পাতায় প্রিয় ছবি
দেশ ও মায়ের মুখ।

একুশের চেতনা

ইরিনা হক

একুশ হলো প্রভাতফেরি
স্বাধীনতার নতুন সূর্য উঠার দিন।

একুশ হলো স্বাধীনতা মাথা উঁচু করে বাঁচা।

একুশ হলো শফিক রফিক সালাম ও জব্বারসহ
অসংখ্য ভাষা শহিদের স্বপ্নপূরণ
একুশ হলো বইমেলার উৎসবমুখর দিন
একুশ হলো মেলায় গিয়ে নতুন বইয়ের গন্ধ নেওয়া
একুশ হলো ফাগুন মাস
শিমুল পলাশ কৃষ্ণচূড়ায় ভালোবাসার ঋণ।
একুশ হলো নতুন আলোর ছটা
মায়ের ভাষায় মাকে ডাকার অবাধ স্বাধীনতা।
একুশ হলো বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নপূরণ।

মায়ের মুখের ভাষা

শেখ সালাহউদ্দীন

মাকে আমার মা বলে ডাকতেই ভালো লাগে
দুঃখ ব্যথা আনন্দ সুখ মান-অভিমান রাগে
আবার যদি ডাকি তাকে মাতা কী জননী
স্নেহটা তার কম হবে না, রবে সে আপনই।

কিন্তু মাকে যদি ডাকি মম, মাজি বা মাম্মি
শুনতে কি খুব মিষ্টি লাগে? মা হয়ে যায় দামি?

আন্টি হলে খালা ফুপু মামি এবং চাচি
তারা কি আর থাকে তখন মনের কাছাকাছি?

কী যে ভীষণ আদর করে দাদি এবং নানি!

ভালো লাগে ডাকতে তাদের গ্র্যানি?

ফুপা খালু মামা কিবা কাকা
এদের যদি আংকেল-ই হয় ডাকা
শুনতে এটা যতই ভালো হোক
মনে হবে এরা দূরের কোনো লোক।

বাবাকে কেউ ডাকে যদি ড্যাড ড্যাডি পিতাজি
খুশিমনে সাড়া দিতে হবে না তো রাজি।

জগৎ জুড়ে আছে কত ভাষা
কোন ভাষাটা সবচেয়ে মিঠে, খাসা?

কোন ভাষাতে পূর্ণতা পায় আমার কাঁদা-হাসা?

এ যে আমার মায়ের মুখের ভাষা, বাংলা ভাষা!

ভাষা শহিদদের গান

নিজামউদ্দীন মুন্সী

আমি গর্বিত
বাংলায় কথা বলতে পেরে
আমি ধন্য আমি অনন্য
জন্ম আমার বাঙালির ঘরে।
বাংলা আমার ভাষা, আমার মা
এ ভাষার শহিদগণ মহাবীর ক্ষণজন্মা।
বায়ান্নয় পাকিস্তান কেড়ে নিতে চায়
বাংলা মায়ের মুখের বুলি
প্রতিবাদমুখর হলো বাঙালি
হায়েনারা চালালো গুলি।
গুলির আঘাতে হলো ম্রিয়মাণ
শহিদের তাজা প্রাণ
প্রাণ দিল বীর বাঙালি
জিতল বাংলার মান,
হায়েনারা হেরে গেল
মেনে নিল অপমান।
ভাষার জন্য আর কোনো জাতি
কোনোদিন দেয়নি প্রাণ,
রাজপথে তাই প্রতিদিন গাই
ভাষা শহিদদের গান।

নিবন্ধ

সেবা যাদের ব্রত

শেখ শামসুল হক

বন্ধুরা, মাত্র ২০ জন কিশোর নিয়ে প্রথম যাত্রা শুরু হয়েছিল স্কাউটিং এর। বর্তমানে বিশ্বের ২১৭টি দেশে তিন কোটি ৮০ লাখ স্কাউট, গাইড এবং বিভিন্ন স্কাউটিং সমিতির প্রতিনিধি আছে। যারা সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে নিরলসভাবে আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত। বাংলাদেশ স্কাউটস সূত্রে জানা যায়, আমাদের দেশে বর্তমানে প্রায় সাড়ে দশ লাখ স্কাউট রয়েছে। বাংলাদেশ অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশে স্কাউটিং এর যাত্রা শুরু হয় ব্রিটিশ আমলে। মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি নামে নতুন করে যাত্রা শুরু করে। এরপর বিশ্ব স্কাউট সংস্থা (WOSM) ১৯৭৪ সালের ১লা জুন বাংলাদেশ স্কাউট সমিতিকে ১০৫তম সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৮ সালে আবার এই সংস্থার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ স্কাউটস। ১৯৯৪ সাল থেকে বাংলাদেশের মেয়েরাও এর সদস্য হয়।

মানব জীবনের একমাত্র ব্রত হলো সেবা। মানব হৃদয়ের সব তৃপ্তি, সুখ ও সাফল্য সেবার মধ্যেই নিহিত। সেবার মূলমন্ত্র নিয়েই ১৯০৭ সালে ইংল্যান্ডের ব্রাউন সি দ্বীপে রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েলের হাত ধরে গড়ে উঠেছিল স্কাউট আন্দোলন।

স্কাউটিং একটি সামাজিক আন্দোলন, যার প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দের মধ্যে শিক্ষা লাভ করা। স্কাউটিং এর মাধ্যমে একজন ছেলে বা মেয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার প্রয়াস লাভ করে। স্কাউটিং এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক মহা আনন্দ যার স্বাদ নিতে হলে যোগদান করতে হয় এই আন্দোলনে। স্কাউট আন্দোলন সব ধরনের ছেলে-মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত। সুষ্ঠু পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশ স্কাউট প্রধানত তিনটি শাখায় বিভক্ত।

১। **কাব স্কাউট-** যে সকল ছেলে-মেয়েদের বয়স ৬ বছরের বেশি কিন্তু এগারো বছরের কম।

২। **স্কাউট-** যে সকল কিশোর-কিশোরীর বয়স এগারো বা তার বেশি তবে সতেরোর কম।

৩। **রোভার স্কাউট-** যে সকল তরুণ-তরুণী কলেজ

বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। যাদের বয়স ১৭ বা তার বেশি তবে ২৫ বছরের কম। তবে রেলওয়ে, বিমান ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে চাকরিজীবীদের জন্য ৩০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

বিশ্ব স্কাউট দিবস ২২শে ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্ব যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দিবসটি পালন করে। স্কাউট আন্দোলনের প্রবক্তা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তারই হাত ধরে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে স্কাউটিং আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ব্যাডেন পাওয়েলের জন্মদিনটি স্মরণ করতেই প্রতি বছর ২২শে ফেব্রুয়ারি স্কাউট দিবস পালন করা হয়। এ দিন বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৩৮ মিলিয়ন স্কাউট এই দিবসটি পালন করে।

স্কাউটিং এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিশু, কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক গুণাবলি উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে পরিবার, সমাজ, দেশ তথা বিশ্বের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। স্কাউট কার্যক্রমে কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়: হাতেকলমে কাজ শেখা, ছোটো দল পদ্ধতিতে কাজ করা, ব্যাজ পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের স্বীকৃতি প্রদান, মুক্তাঙ্গনে কাজ সম্পাদন, তিন আঙুলে সালাম ও ডান হাতে করমর্দন, স্কাউট পোশাক, স্কার্ফ ও ব্যাজ পরিধান এবং সর্বদা স্কাউট আইন ও প্রতিজ্ঞা মেনে চলা। স্কাউটদেরকে স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেল পাওয়েলের নির্দেশিত নিয়ম অনুসারে অনুশীলন, প্রতিজ্ঞা পাঠ ও দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে স্কাউট আন্দোলনে সদস্য হতে হয়। স্কাউটদের মটো বা মূলমন্ত্র হচ্ছে: কাব- যথাসাধ্য চেষ্টা করা, স্কাউট- সদা প্রস্তুত এবং রোভার- সেবাদান।

এছাড়া বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বিভিন্ন গ্রুপ ও জেলা পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে বৃক্ষরোপণ, টিকাদান, স্যানিটেশন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, জ্বালানি-সাশ্রয়ী চুলা, এবং বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় স্কাউটদের সেবাদান কর্মসূচি বাংলাদেশের মানুষ সর্বদাই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

স্কাউটদের এ সকল কার্যক্রম এবং বিভিন্ন ট্রেনিং এর জন্য বিভিন্ন ব্যাজ প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। স্কাউটের তিনটি শাখার জন্য সর্বোচ্চ ব্যাজ হচ্ছে: শাপলা কাব, প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট এবং প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট। অ্যাডাল্ট লিডারদের স্কাউটিং-এ অবদান রাখার জন্য তাদেরকেও বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এর মধ্যে সর্বোচ্চ রৌপ্য ব্যাঘ্র এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হচ্ছে রৌপ্য ইলিশ। বিশ্ব স্কাউট সংস্থাও বিভিন্ন দেশের অসাধারণ স্কাউটদের দিয়ে থাকে ব্রোঞ্জ উলফ ব্যাজ।

স্কাউটিং-এ রয়েছে অনেক দিক। কিছু দিক যেমন– ক্যাম্পিং, হাইকিং, ফার্স্ট এইড, দড়ির কাজ, পাইওনিয়ারিং, রান্না, অনুমান, খেলা এবং আরো কত কী। মজার মজার এসব বিষয় শিখে ফেলা যায় নিজের অজান্তেই। এমনকি কিছু বিষয়ে হয়ে ওঠা যায় পারদর্শী। তখন সে অনুযায়ী পোশাকে লাগানো যায় নিত্য-নতুন ব্যাজ। পাত্র ছাড়া রান্না কিংবা দড়ি দিয়ে কিছু তৈরি করতে পারার মজা আর কোথাও নেই। এছাড়াও কোনো কম্পাস ছাড়াই দিক নির্ণয় অথবা অনুমান করে বলে দিতে পারা যায় কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ কিংবা উচ্চতা। তাঁবুতে থাকার অভিজ্ঞতা আর হেঁটে হেঁটে প্রকৃতির সাথে চলা এক নতুন জীবনের স্বাদ এনে দেয় স্কাউটিং। যান্ত্রিক জীবনের আড়ালে হারিয়ে যায় সকল ইচ্ছা, চলে যায় নতুন এর স্বাদ। স্কাউটিং ফিরিয়ে আনে সেই ইচ্ছাগুলো আর সকল কাজে এনে দেয় উৎসাহ।

একজন স্কাউট এগিয়ে যায় সকলের সাহায্যে। কোনো কিছু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নয়, মানবতার টানে। কাউকে রাস্তা পার করে দেওয়া থেকে দুর্ঘটনায় কবলিত কোনো ব্যাক্তিকে সর্বোচ্চ সহায়তা করতে দ্বিধাবোধ করে না সে। যে-কোনো বিপদে বিচলিত না হয়ে ধীরে-সুস্থে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা যে সে আগেই পেয়ে থাকে স্কাউটিং থেকে।

স্কাউটিং নেতৃত্বদানে করে তোলে পারদর্শী। ছোটোবেলা থেকেই একটি দলে থাকার মজা এবং কাজগুলো ভাগ করে নেওয়ার শিক্ষা দিয়ে দেয় স্কাউটিং। ফলে কাজটা কীভাবে শেষ করা যাবে কিংবা কাকে দিয়ে করালে ভালো হবে, সেই নেতৃত্ব গুণ থাকে একজন স্কাউট এর। সকলকে বুঝিয়ে এক সাথে কাজ করার আনন্দ স্কাউটিং–এ থাকে। ফলে নতুন করে কোনো কিছুই বুঝে নিতে হয় না, জীবনে সকল কাজেই সফলভাবে নেতৃত্ব দিতে পারে সে। এসকল গুণের স্বীকৃতি স্বরূপ স্কাউটদের দেওয়া হয় অ্যাওয়ার্ড। কাবদের শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড, স্কাউটদের প্রেসিডেন্টস স্কাউট অ্যাওয়ার্ড, রোভারদের প্রেসিডেন্টস রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড। অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত স্কাউটদের নাম লিখে রাখা হয় সযত্নে।

স্কাউটিং এমন একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষামূলক ও অরাজনৈতিক আন্দোলন, যার মাধ্যমে শিশু-কিশোর-যুবকদের শারীরিক মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিভিত্তিক ও আধ্যাত্মিকভাবে যোগ্য করে গড়ে তোলা হয়।

একটি মজার ব্যাপার হলো স্কাউটিং-ই বিশ্বের একমাত্র সংগঠন, যেখানে যোগদান করতে হলে আত্মশুদ্ধি পালন করতে হয়। আগ্রহীদের অতীত জীবনের খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করে স্কাউট প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হয়। স্কাউট প্রতিজ্ঞা হলো–

> ‘আমি, আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে, আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে সর্বদা অপরকে সাহায্য ও স্কাউট আইন মেনে চলতে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

বাংলাদেশের স্কাউটদের ৭টি আইনও রয়েছে- যেগুলো সব সময় মেনে চলতে হয়। যেমন–

১. স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
২. স্কাউট সবার বন্ধু
৩. স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
৪. জীবনের প্রতি সদয়
৫. সদা প্রফুল্ল
৬. মিতব্যয়ী
৭. চিন্তা কথা ও কাজে নির্মল।

স্কাউটের তিনটি মূলনীতি রয়েছে, যেগুলো সদা সর্বদা অনুসরণ করতে হয়। এগুলো হলো- সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্য, নিজের প্রতি কর্তব্য ও অপরের প্রতি কর্তব্য।

স্কাউটিং সকলকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। সকল মানবিক গুনাবলি কমবেশি দেখা যায় স্কাউটদের মধ্যে। নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা এবং সকলের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার মন-মানসিকতা থাকে তাদের মধ্যে।

বাংলাদেশে স্কাউটিং এগিয়ে যাচ্ছে নিজ গতিতে। ছেলে-মেয়েরা স্কাউটিং এর মধ্য দিয়ে হয়ে উঠে আত্মনির্ভরশীল। নানান শিক্ষার মধ্য দিয়ে বাড়ে তাদের দক্ষতা নির্মল আনন্দের মধ্য দিয়ে।

২০০৭ সালে স্কাউট আন্দোলনের শতবর্ষ পালন উপলক্ষ্যে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা ‘এক বিশ্ব এক প্রতিজ্ঞা’ থিম নির্ধারণ করে যুক্তরাজ্যে বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরিসহ নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে। বাংলাদেশ স্কাউটও যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করে তার মধ্যে; আন্তর্জাতিক শতবর্ষ কমডেক, জাম্বুরি অন দ্য ট্রেন, চতুর্থ এ.পি.আর এয়ার ইন্টারনেট জাম্বুরি, নবম জাতীয় রোভার মুট এবং দ্বাদশ মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে স্কাউটদেরকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সৎ, চরিত্রবান, কর্মোদ্যোগী সেবাপরায়ণ, সর্বোপরি সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে দেশ ও জাতি গঠনে স্কাউট আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিহার্য। ■

লেখক: প্রাবন্ধিক

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস

শাহানা আফরোজ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলেছেন, 'এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া আছে। বই হচ্ছে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে বেঁধে দেয়া সাঁকো।'

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'জীবনে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন বই, বই এবং বই।'

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম বলেন, 'একটি বই একশটি বন্ধুর সমান, কিন্তু একজন ভালো বন্ধু, পুরো একটি লাইব্রেরির সমান।'

দেকার্তে বলেন, 'ভালো বই পড়া মানে গত শতাব্দীর সেরা মানুষদের সঙ্গে কথা বলা।'

মনীষীদের এই উক্তিগুলো থেকে খুব সহজেই বুঝা যায়, উন্নত জাতি গঠনে গ্রন্থ বা বই এবং গ্রন্থাগারের(লাইব্রেরি) গুরুত্ব অপরিসীম। সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে গ্রন্থাগারগুলোকে টিকিয়ে রাখতে হবে। গ্রন্থাগার হচ্ছে সভ্যতার বাহন। জাতীয় গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ২০১৮ সাল থেকে দেশব্যাপী ৫ই ফেব্রুয়ারি গ্রন্থাগার দিবস পালন করে আসছে। এবারের দিবসের প্রতিপাদ্য 'মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার'। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। তাই এ দিনটিকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী জেলা, উপজেলা পর্যায়ে এখন মোট গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭১টি। যে পরিবারে গ্রন্থাগার আছে, সে পরিবারে এক ধরনের আলাদা জ্যোতি ছড়ায়। শিশুদের বই পড়ায় উদ্বুদ্ধ করতে ছোটো হলেও প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের যদি আমরা সঠিক জ্ঞানের রাজ্যে নিয়ে যেতে পারি, বই পড়ার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে পারি, তাহলে তারা জঙ্গিবাদে জড়াবে না, অন্যায় করবে না, ইভটিজিং করবে না, মাদকাসক্ত হবে না, প্রতিপক্ষকে তাড়া করবে না। বই - এর আলোয় উদ্ভাসিত হবে মনের জানালা। তাদের পরিচয় হবে বিশিষ্ট লেখক ও মহামানবদের সঙ্গে। বঙ্গবন্ধুও প্রচুর শিল্প-সাহিত্যের বই পড়তেন,। পড়ুয়া মানুষ ছিলেন তিনি। তার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' ও 'আমার দেখা নয়া চীন' বইতে পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধুর নিবিষ্ট এক পাঠকসত্তাকে। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে ছিল জর্জ বার্নার্ড শ, বার্ট্রান্ড রাসেলের রচনাবলি, মাও সে তুং স্বাক্ষরিত গ্রন্থ। নিজেকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করেছেন বই পড়ে । পরবর্তী জীবনে রাষ্ট্র পরিচালনায় সেইসব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সরকার ঘোষিত মুজিববর্ষে দিবসটির তাৎপর্য আরো বেড়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর আদর্শ, দর্শন, চিন্তাচেতনা, উদ্যোগ সবই লিপিবদ্ধ আছে বইয়ের পাতায়। সামনে এগিয়ে যেতে হলে প্রকৃত ইতিহাস জানতে হবে, আর ইতিহাসের সেই গল্প লেখা আছে বইয়ে, আর সেই বই সংরক্ষিত আছে গ্রন্থাগারে। জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসে গ্রন্থ, গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকতা শব্দগুলো একই সূত্রে গাথা হোক এটাই আমাদের সবার প্রত্যাশা। তবেই আগামী প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা। ■

ব্যতিক্রমী মাস

মেজবাউল হক

ছোট্ট বন্ধুরা, ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের জাতীয় জীবনে এক ঐতিহাসিক মাস। এ মাসে আমরা পেয়েছি মায়ের ভাষা, মুখের ভাষা, প্রিয় বাংলা ভাষা। কিন্তু বন্ধুরা তোমরা কি জানো ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসটি অন্যান্য বছরের থেকে একদম ব্যতিক্রম। এই মাসের প্রতিটি দিন চারদিন করে। এছাড়াও ফেব্রুয়ারি মাসকে নিয়ে আরো একটি মজার তথ্য তোমাদের জানাচ্ছি–ইংরেজি সালের অন্য মাসগুলো ৩০ দিন কিংবা ৩১ দিনে হলেও ফেব্রুয়ারি মাস কিন্তু শেষ হয় ২৮ দিনে। কেন এমনটা হয়ে থাকে? এর পিছনে রয়েছে মজার এক কাহিনি। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সূত্র মতে, আমরা যে ক্যালেন্ডার ব্যবহার করি সেটিকে বলা হয় গ্রেগরিয়ান যুগের ক্যালেন্ডার। গ্রেগরিয়ান যুগের আগে যে ক্যালেন্ডার প্রচলন ছিল সেটি হলো জুলিয়ান ক্যালেন্ডার।

সে সময়ে রোমানরা গ্রিক পঞ্জিকায় বছরকে হিসাব করত ৩০৪ দিনে। মাস ছিল দশটি। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি নামে কোনো মাসই ছিল না। বছরের প্রথম মাস শুরু হতো মার্চ মাস দিয়ে। সে সময় রাজা নূমাপম্পিলিয়াস বছরে ক্যালেন্ডারে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসকে অন্তর্ভুক্ত করেন। বছরের শেষ মাস ছিল ফেব্রুয়ারি। সেই সময় জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি দুই মাসকেই ৩১ দিন হিসাব করা হতো। কিন্তু এতে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। ঋতুর সঙ্গে সময়ের তারতাম্য মিলছিল না। পরবর্তীতে জুলিয়াস সিজার নতুন করে ইংরেজি সালকে সাজান। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসকে এগিয়ে আনলেন প্রথমদিকে। ফেব্রুয়ারি মাস যেহেতু একেবারে নতুন ছিল, সেজন্য দিনের হিসাবের সুবিধার জন্য ২৮ দিনে ধরা হয়। সেই থেকে আজ অবধি ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনে প্রচলিত।

তবে বন্ধুরা, আরেকটি অবাক করা বিষয় হলো প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনে থাকে না। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা। সেই হিসাব অনুযায়ী প্রতি ৪ বছর পর ২৪ ঘণ্টা, অর্থাৎ একটি দিন অতিরিক্ত থেকে যায়। আর সেই দিনটি যোগ করা হয় ফেব্রুয়ারি মাসের সঙ্গে। তাই চার বছর পর পর ফেব্রুয়ারি মাসের দিন সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯ দিন। এই বাড়তি দিনটাই হলো ২৯শে ফেব্রুয়ারি। আর এ রকম বছরকেই বলা হয় লিপইয়ার বা অধিবর্ষ। ■

ভাষা নিয়ে যুদ্ধ

শেহ্‌জাদী ফারহা অর্থি

অনেক অনেক দিন আগের কথা। তখন আমাদের দেশে অনেক বড়ো একটা যুদ্ধ হয়েছিল। ভাষা নিয়ে যুদ্ধ।

পৃথিবীতে এ রকম যুদ্ধ এর আগে কখনো হয়নি। তখন ছিল ১৯৫২ সাল।

দেশ নিয়ে যুদ্ধ হয় শুনেছি। ভাষা নিয়ে যুদ্ধ আবার কী করে হয়? আমরা যে ভাষায় কথা বলি তা বাংলা ভাষা।

সেই সময় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা বাধা দেয়- বাংলা ভাষায় কথা বলা যাবে না। কথা বলতে হবে কঠিন উর্দু ভাষায়।

বাবা-মা, ফুফি, দাদি, নানুমনিরা মজা করে শিশুদের বাংলায় গল্প শুনাতে পারবে না। এটা কী করে হয়?

তারপর আমাদের দেশের মানুষ মানলই না তাদের কথা। কেউ কী মানে এসব কথা! আমিও মানি না।

সহজ মিষ্টি বাংলা ভাষা রেখে কী কেউ কঠিন উর্দু ভাষায় কথা বলে?

একদিন সবাই মিছিল করতে নেমে পড়ল রাজপথে। তখন ছিল ফেব্রুয়ারি মাসের একুশ তারিখ।

সবাই স্লোগান দিতে লাগল- রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। উর্দু ভাষা মানি না।

মিছিল দেখে পাকিস্তানিরা গেল খুব রেগে। তারা গুলি করল মিছিলে।

শহিদ হলেন- রফিক, শফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরো নাম না জানা অনেক মানুষ।

এরপর যুদ্ধের পর পাকিস্তানিরা ভয় পেয়ে আমাদের ভাষাই মেনে নিল।

সেই থেকে বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা। ■

১ম শ্রেণি, আনোয়ার মান্নাফ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উত্তরা, ঢাকা

ছোটোদের ছড়া

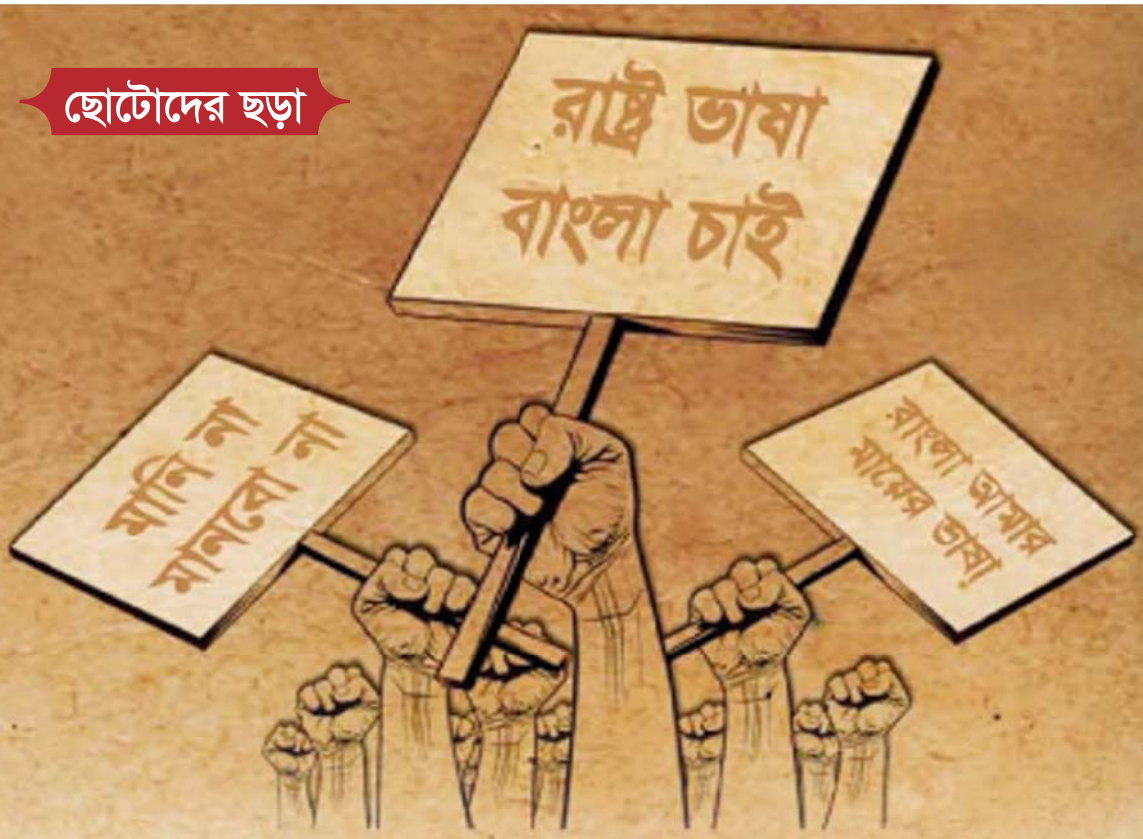

মায়ের ভাষার দিন

নওশিনা ইসলাম

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
মিষ্টি মধুর লাগে,
গানে গানে এই ভাষাতে
হৃদয় আমার জাগে।
এই ভাষাতে পড়ি লিখি
মনের কথা কই,
ভালো লাগে গল্প-ছড়া
হরেক রকম বই।
ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
মায়ের ভাষার দিন,
যাঁদের জন্য পেলাম ভাষা
স্মরি তাঁদের ঋণ।

একাদশ শ্রেণি, উল্লাপাড়া বিজ্ঞান কলেজ, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ

একুশ

সুহিন হোসেন

একুশ আমার স্বপ্নে আঁকা
বর্ণমালায় তুলি
একুশ আমার মুখের হাসি
একুশ আমার বুলি।

রক্ত ঝরিয়ে একুশ পেলাম
একুশ ব্যথার গান
একুশ আমার ভাষার দাবি
একুশ আমার প্রাণ।

৫ম শ্রেণি, হাজী আব্দুল গণি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

ছোটো থেকেই শিখতে হবে

রকিবুল ইসলাম

বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো।

বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কত কিছুই না করতে হয়। চলতে ফিরতে কত মানুষের সাথে কথা বলতে হয়। মানুষের সাথে কাজ করতে হয়।

আর মানুষের সাথে চলতে বসতে আমাদের কিছু আচরণ করতে হয়। ভালো আচরণ করা মানুষকে সবাই ভালোবাসে। তাই আচরণগত কিছু আদবকায়দা আমাদের জানতে হবে। কীভাবে চলব, কীভাবে কথা বলব এসবই আচরণ। আচরণের কারণেই মানুষ একে অন্যকে মনে রাখে। তাই শিক্ষণীয় একটি গল্প তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই:

টিপু ওর দাদুর সঙ্গে স্কুল থেকে ফিরছিল। সে এবার ক্লাস থ্রিতে পড়ে। প্রতিদিন ওর বাবা ওকে স্কুলে দিয়ে অফিসে যান। ছুটি হলে দাদুর সঙ্গে বাড়ি আসে। তো সেদিনও হেঁটে হেঁটে আসছিল। দাদু ওকে আসার সময় মজার মজার গল্প শোনান। টিপুও এতে খুব মজা পায়। ওরা রাস্তার বামপাশ দিয়ে আসছিল। দাদু ডানে। টিপু বামে। দাদুর বাম হাতের আঙুল টিপুর ডান হাতের মুঠে। টিপু হঠাৎ দাদুর আঙুল ছেড়ে দিলো। ছেড়ে দিয়েই নিচে উপুড় হলো। দাদু চমকে উঠে নিচে তাকালেন। টিপু কী যেন তুলে নিয়ে আবার দাঁড়ালো। টিপুর হাতে ময়লা লাগানো বিশ টাকার একটা নোট! দাদুর দিকে মেলে ধরল।

টিপু বলল, দাদু এই দেখো আমি বিশ টাকার নোট পেয়েছি।

দাদু বললেন, না না দাদু, পড়ে থাকা কিছু নিতে নেই।

টিপু বলল, কেন দাদু, আমি তো এ টাকা কুড়িয়ে পেয়েছি। আমি তো চুরি করিনি।

দাদু বললেন, পড়ে পাওয়া জিনিস নেওয়া আর চুরি করা একই কথা। যাক, তুমি আগে টাকাটা ওখানে রেখে দাও। আমি পরে তোমাকে বুঝিয়ে বলছি।

টিপু মন খারাপ করে টাকাটা আগের জায়গায় রেখে দিলো। তারপর দাদুর আঙুল ধরে আবার হাঁটতে লাগল।

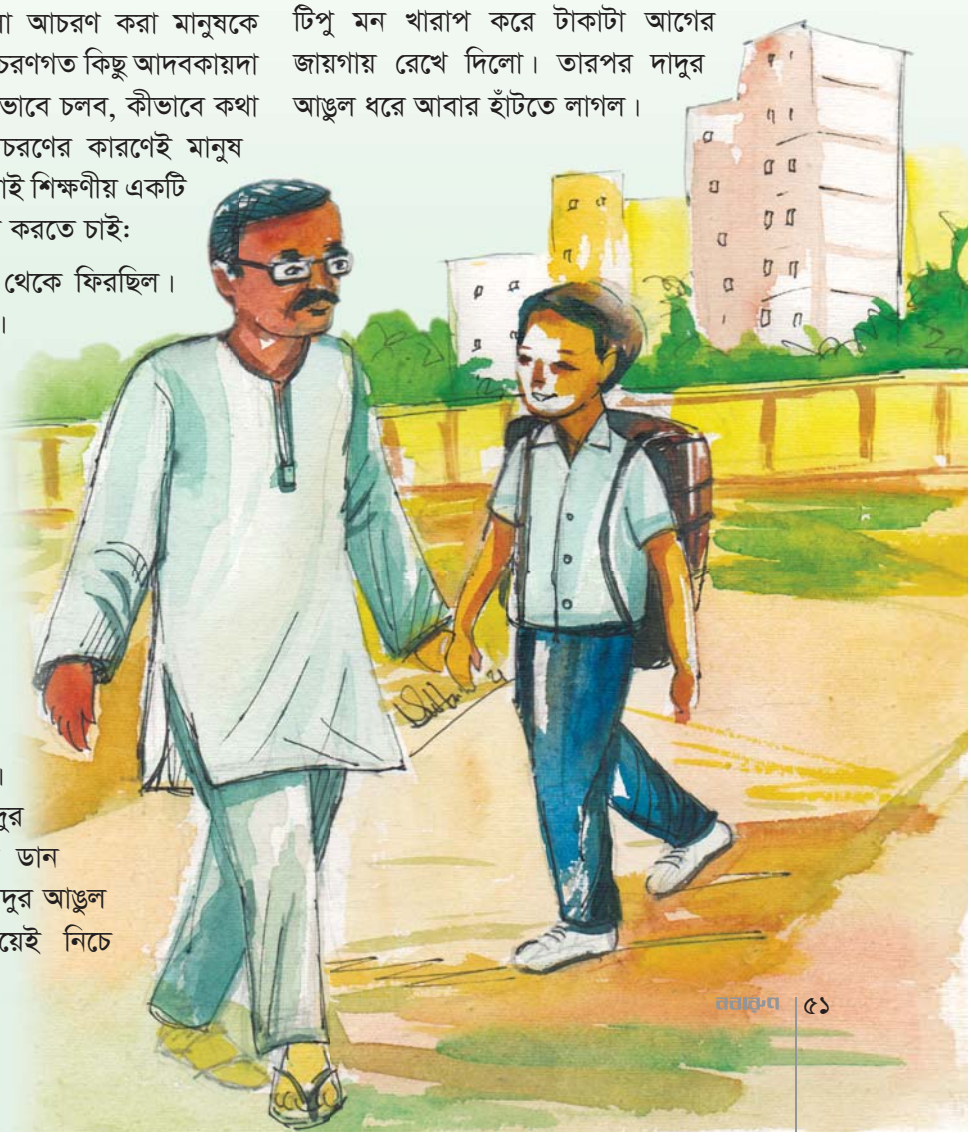

দাদু বললেন, শোনো টিপু, কখনো পড়ে থাকা কোনো কিছু ধরবে না।

টিপু মন খারাপ করে বলল, কেন ধরব না দাদু? আমি না নিলে তো অন্য কেউ নিবেই।

কেউ নিবে না। কারোই নেওয়া উচিত নয়। ধরো, যার টাকাটা হারিয়েছে সে কতই না খোঁজাখুঁজি করছে! খুঁজতে খুঁজতে সে তো এই পথে আসতেই পারে। ভাববে, দেখি তো রাস্তায় পড়ল কিনা!

টিপু কী যেন ভাবতে থাকে।

দাদু আবার বললেন, ধরো আমরা কেউ টাকাটা নিলাম না। তাহলে কী হবে?

টিপু এবার হাসিমুখে বলল, যার টাকা সে পেয়ে যাবে।

দাদু বললেন, এই তো তুমি ধরতে পেরেছ। শোনো, কারও কিছু হারালে সে ভীষণ কষ্ট পায়। তুমি তোমার কোনো জিনিস হারিয়ে ফেললে কেমন লাগে? সেদিন যেমন লাটিম হারিয়ে কী কান্নাই না করলে!

টিপু হাসতে হাসতে বলল, ঠিক বলেছ দাদু। কিছু হারিয়ে গেলে খুব কষ্ট লাগে। আবার সেটা পাওয়া গেলেও ভীষণ আনন্দ লাগে।

দাদু বললেন, ঠিক তাই। যত দামি আর আকর্ষণীয় জিনিসই হোক, পড়ে থাকা কোনো কিছুই ধরা যাবে না।

টিপু বলল, এখন থেকে আমি আর কখনো পড়ে থাকা জিনিস ধরব না।

বন্ধুরা, নিশ্চয়ই তোমরা গল্পটির মূল কথা বুঝতে পেরেছ। টিপু তাহলে কী শিখল? পড়ে থাকা কোনো কিছু সে ধরবে না। তাহলে তোমরাও এটা শিখে রাখো। আমাদের সামনে যত মূল্যবান জিনিসই থাকুক না কেন, সেটা কখনোই তুলে নেব না। ■

লেখক: গল্পকার ও প্রাবন্ধিক

রামিসা নিগার রুমা, ২য় শ্রেণি, ঢালারপাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

বাংলাদেশের উপহার

সালেহ সালেহীন

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও জলবায়ুর কারণে বাংলাদেশের উদ্ভিদ জগত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বিশ্বের খুব কম দেশেই এত অল্প স্থানে এত প্রজাতির বৃক্ষ রয়েছে। এর কারণ, বাংলাদেশের ভূখণ্ডে পলিবাহিত সমতল ভূমি, মিষ্টিপানির প্রবাহ, সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকা এবং পাহাড়ি এলাকার পরিবেশ ব্যবস্থা। তাই এখানে নানা ধরনের উদ্ভিদ জন্মে।

প্রকৃতি সংরক্ষণ বিষয়ক বৈশ্বিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচারের (আইইউসিএন) হিসাবে বিশ্বে প্রায় পাঁচ লাখ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২ লাখ ৯৫ হাজার উদ্ভিদকে শনাক্ত করেছে কিউ হারবেরিয়াম। ঔপনিবেশিক আমলে বিভিন্ন দেশ থেকে উদ্ভিদ প্রজাতি সংগ্রহ করে ব্রিটিশরা কিউ হারবেরিয়াম নামে উদ্ভিদের বিরাট সংগ্রহশালা গড়ে তোলে। দেশের উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে, যুক্তরাজ্যের কিউ হারবেরিয়ামের ভারতবর্ষ থেকে সংগ্রহ করা ২৫ হাজার প্রজাতির বৃক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে গিয়েছে সাত হাজার প্রজাতির বৃক্ষ। উদ্ভিদের প্রজাতি সংরক্ষণ বিষয়ক রাষ্ট্রীয় সংস্থা বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের হিসাবে, আমাদের দেশে ২০১৯ সাল পর্যন্ত উদ্ভিদের প্রজাতি ছিল ৩ হাজার ৮৪০টি। যদিও পরে আরো ১০টি উদ্ভিদ প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের বিজ্ঞানীরা কিউ হারবেরিয়ামে বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত উদ্ভিদগুলোর একটি অংশ পরীক্ষা করতে পেরেছেন। এর মধ্যে তারা ৭১টি উদ্ভিদ খুঁজে পেয়েছেন, যেগুলো সম্পর্কে কোনো তথ্য দেশের আগের কোনো জরিপ বা গবেষণায় পাওয়া যায়নি। এসব উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম রয়েছে। তবে কোনো স্থানীয় বা বাংলা নাম দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে দেশে ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের গবেষক দলটি জরিপ চালিয়ে যে ৭৯টি প্রজাতি খুঁজে পেয়েছে, তার ১৮টি উদ্ভিদ পরিবারের। এসব উদ্ভিদের ৭৫টি প্রজাতি দেশের তিন পার্বত্য জেলা-রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে পাওয়া যায়। এর মধ্যে (৮টি) প্রজাতি পাওয়া গেছে একানটেসেই বা বাসক পরিবারভুক্ত।

যা মূলত ঔষধি বৃক্ষ হিসেবে পরিচিত। এর পরেই রয়েছে ইউফরবিয়াসিস প্রজাতির। এই পরিবারের ছয়টি প্রজাতি পাওয়া গেছে। এর সাথে এ বছর যোগ হয়েছে নতুন আরো চারটি গাছ। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা গত চার বছরে এই চার উদ্ভিদ আবিষ্কার করেন। এর বাইরে চার বছরে দেশের উদ্ভিদ প্রজাতির তালিকায়ও ১৫০টি নতুন নাম যুক্ত হয়েছে।

বিশ্বের উদ্ভিদকূলে চারটি নতুন নাম যোগ করেছে বাংলাদেশ। এর দুটি পাওয়া গেছে মৌলভীবাজারের লাউয়াছড়া বনে। বাকি দুটির একটি বান্দরবানে, অন্যটি শেরপুরের বনভূমিতে। চারটি উদ্ভিদই কচুজাতীয়। নতুন চার উদ্ভিদ আবিষ্কারে নেতৃত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের সাবেক পরিচালক হোসনে আরা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক আবুল হাসান। তাঁদের জরিপের ফল ২০১৮ সালে ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশ করা হয়।

নতুন চারটি উদ্ভিদগুলো হলো:

আলোকেসিয়া হারাগানজেসিস: মৌলভীবাজারের লাউয়াছড়ার হারাগঞ্জ সংরক্ষিত বনে আলোকেসিয়া হারাগানজেসিস পাওয়া যায়। তাই ওই বনের নামেই উদ্ভিদটির নামকরণ করা হয়। অবশ্য হবিগঞ্জের রেমা-কালেঙ্গা বনেও এই উদ্ভিদ দেখতে পেয়েছেন গবেষকেরা।

আলোকাসিয়া সালারখানি: নতুন আবিষ্কৃত দ্বিতীয় উদ্ভিদটি মৌলভীবাজারের লাউয়াছড়া বনভূমি থেকে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস চর্চা, অর্থাৎ কোন উদ্ভিদ কোন প্রজাতির, তা নির্বাচন করার বিদ্যার জনক হিসেবে পরিচিত অধ্যাপক মোহাম্মদ সালার খানের নামে এই উদ্ভিদটির নামকরণ করা হয়। বাংলাদেশের এই বিজ্ঞানী ১৯৯৭ সালে মারা যান।

টাইফোনিয়াম ইলাটাম: তৃতীয় উদ্ভিদটির নাম রাখা ও সংগ্রহ করা হয়েছে শেরপুর জেলার বনভূমি থেকে।

কলোকাসিয়া হাসানী: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক আবুল হাসানের নামে চতুর্থ উদ্ভিদটির নামকরণ করা হয়, যিনি উদ্ভিদটি আবিষ্কারে থাকা গবেষক দলের অন্যতম সদস্য। এটিকে স্থানীয়ভাবে বলা হয়ে থাকে তিতা কচু। উদ্ভিদটি সংগ্রহ করা হয় বান্দরবান জেলার বনভূমি থেকে। তবে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে এই প্রজাতিটি দেখা গেছে।

নতুন আবিষ্কৃত কচুজাতীয় চারটি উদ্ভিদই স্থানীয়ভাবে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয় না।

রয়েছে আরো প্রজাতি: আমাদের দেশের বনভূমি ছাড়া নদী ও সাগরে প্রচুর উদ্ভিদ রয়েছে। সেখানে এখনো জরিপ হয়নি। ফলে দেশে প্রকৃতপক্ষে কত ধরনের উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে, তা এখনো অজানা। ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের প্রতিষ্ঠাতা সালার খান বাংলাদেশে কমপক্ষে পাঁচ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ থাকতে পারে বলে জানিয়েছিলেন। তবে তিনি বিস্তারিত কোনো তালিকা করে যেতে পারেননি। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশ করা ফ্লোরা অব বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের উদ্ভিদকূল বইতে ৩ হাজার ৬১১টি উদ্ভিদের তালিকা দেওয়া ছিল।

ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের হিসাবে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ৩ হাজার ৮৩০টি উদ্ভিদের প্রজাতি ছিল। চলতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের নেতৃত্বে আরো দুটি প্রজাতির উদ্ভিদ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর বাইরে আরো কমপক্ষে আট প্রজাতির উদ্ভিদ আবিষ্কার করেছেন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা। সেই হিসাবে বর্তমানে দেশে উদ্ভিদের প্রজাতি দাঁড়াবে ৩ হাজার ৮৪০টি। ■

লেখক: শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ফসলের মাঠে বঙ্গবন্ধু

মো. জামাল উদ্দিন

ফসলের মাঠ। রোপণ করা হয়েছে শস্য। সেই শস্যের মাঠে জাতির পিতার মুখ হেসে উঠেছে। ফসলের এই শিল্পকর্ম ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে মাঠে শস্য রোপণ করে তৈরি করেছেন আব্দুল কাদির নামে এক কৃষক।

লালশাক আর সরিষার চারাগুলো বড়ো হয় আর স্পষ্ট ও নান্দনিক হয়ে উঠছে বাংলাদেশের স্থপতির অবয়ব। বঙ্গবন্ধুর প্রতি অগাধ ভালোবাসা থেকেই ফসলের এমন শিল্পকর্ম তৈরি করেছেন বলে জানান কৃষক আব্দুল কাদির। যে জমিনে পরম ভালোবাসায় বেড়ে উঠে শস্য, সেই জমিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতি হৃদয় খচিত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি।

আব্দুল কাদির ১লা ডিসেম্বর নিজের ৩৩ শতক জমিতে বন্ধু মহল ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে এঁকেছেন অনন্য এই শিল্পকর্ম। মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৪১ বছর বয়সি আবদুল কাদির পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় নিজেদের জমিতে কাজ শুরু করেন। পরে আর পড়ালেখা হয়নি। মাঠেই দিন-রাত পরিশ্রম করে সোনার ফসল ফলান তিনি। কাদিরের শৈল্পিক কৃষিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি দেখতে ও ছবি তুলতে জমির পাশেই নির্মাণ করা হয়েছে বাঁশ দিয়ে একটি টাওয়ার।

শস্যচিত্রে জাতির পিতার সর্ববৃহৎ প্রতিকৃতি

মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে 'শস্যচিত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু' মোজাইক উপস্থাপন করে গ্রিনেজ বুক অব ওয়াল্ড রেকর্ড পদযাত্রায় স্থান করে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বগুড়ার শেরপুর উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের বালেন্দা গ্রামের ১২০ বিঘা জমিতে ধান চাষের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি। 'শস্যচিত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু' জাতীয় পরিষদ-এর উদ্যোগে এবং ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ারের সহযোগিতায় ব্যতিক্রমী এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বগুড়ার শেরপুরের বালেন্দা গ্রামের একত্রে ১২০বিঘা জমি কৃষকদের নিকট থেকে লিজ নেয়া হয়েছে। এরপর সেখানে বিদেশ থেকে আমদানি করা বেগুনি ও সবুজ দুই ধরনের হাইব্রিড ধানের চারা উৎপাদন করা হয়েছে। ২৯শে জানুয়ারি দুপুর ১২টার দিকে পরিকল্পনা মোতাবেক বিএনসিসির ক্যাডেটদের সহযোগিতায় স্থানীয় কৃষকদের দিয়ে এসব চারা রোপণ করা হয়েছে। যাতে পাখির চোখে (উঁচু থেকে) জমিতে রোপণকৃত ধানের দৃশ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ধরা পড়বে। ■

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ম্যারাথন-২০২১

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকার হাতিরঝিলে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকা ম্যারাথন-২০২১। দেশ-বিদেশের প্রায় ২০০ দৌড়বিদ অংশ নেন এই ম্যারাথনে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল ১০ই জানুয়ারি ভোর ৬টায় ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে এই ম্যারাথন উদ্‌বোধন করেন। এ সময় তিনি বলেন, 'সারা পৃথিবীতে বঙ্গবন্ধু ম্যারাথনই ২০২১ সালের সবচেয়ে বড়ো ক্রীড়ানুষ্ঠান। ক্রীড়াক্ষেত্রে এই ইভেন্ট একটা মাইলফলক হয়ে থাকবে।' এ সময় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেলও উপস্থিত ছিলেন।

এই ম্যারাথন আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন ও বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন।

এই ম্যারাথনে বাংলাদেশসহ ফ্রান্স, কোরিয়া, ইথিওপিয়া, বাহারাইন, বেলারুশ, ইউক্রেন ও মরক্কো থেকে রানার এবং মালদ্বীপ, নেপাল, ভারত, লেসেফো ও স্পেন থেকে সাফ রানারসহ মোট ৩৭জন অ্যাথলেট এই ম্যারাথনে অংশ নেন।

ফুল ম্যারাথন, হাফ ম্যারাথনের পাশাপাশি ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে ডিজিটাল ম্যারাথনের আয়োজন করেন আয়োজকরা। যাতে দেশ-বিদেশের যে কেউ নিবন্ধন করে তার সুবিধাজনক স্থানে ৫কি.মি. দৌড়ে অংশ নিতে পারেন। ফুল ম্যারাথনে দেশি-বিদেশি ১০০জন দৌড়বিদ ৪২.১৯৫ কিলোমিটার এবং হাফ ম্যারাথনে ১০০জন দৌড়বিদ ২১.০৯৭ কিলোমিটার দৌড়ান। বিদেশি দৌড়বিদদের মধ্যে 'এলিট' শ্রেণিতে ১৭জন ও 'সাব এলিট' শ্রেণিতে ১২জন দৌড়ান। এই ম্যারাথনে বাংলাদেশের সাধারণ দৌড়বিদদের পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও আনসার সদস্যরাও অংশ নেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ম্যারাথন আর্মি স্টেডিয়াম থেকে বনানী কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, গুলশান-২ চত্বর, গুলশান-১ চত্বর হয়ে হাতিরঝিলে এসে শেষ হয়। হাফ ম্যারাথনে প্রথম হয়েছে কোরিয়ার এডিউন, দ্বিতীয় হয়েছেন বাহারাইনের তাউহিদ, তৃতীয় হয়েছেন স্পেনের আলফাজ আজিজ। ফুল ম্যারাথনে প্রথম হয়েছেন মরক্কোর হিসাব। এছাড়া একই দিনে শুরু হওয়া ডিজিটাল ম্যারাথন শেষ হবে ৭ই মার্চ। প্রতিযোগিতা শেষে হাতিরঝিল এম্ফি থিয়েটারে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকা ম্যারাথন আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন (আইএএ) এবং অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল ম্যারাথন অ্যান্ড ডিসটেন্স রেসেসের (এইমস) অনুমোদন পেয়েছে। ■

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

কৃষকের ছেলের বিমান আকাশে

কৃষক পরিবারের ছেলের বিমান উড়ছে আকাশে। কী চমৎকার খবর তাই না বন্ধুরা। ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল উপজেলার বালিদারা গ্রামের কৃষকের সন্তান সালাউদ্দিন। স্বপ্ন পাইলট হওয়া। গ্রামের কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে সালাউদ্দিন। এরপর গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে কৃষি বিভাগে ভর্তি হন। ২০১৭ সালে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে দূরপাল্লার চালকবিহীন বিমান তৈরির কাজ শুরু করেন। চার বছর চেষ্টার পর ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে বিমান ওড়াতে পারেন তিনি। তার তৈরি বিমানটি ৫ কিলোমিটার নিয়ন্ত্রণ রেখায় সর্বোচ্চ ২০০০ ফুট উচ্চতায় এবং ১০০ কিলোমিটার গতিতে ২০ মিনিট উড্ডয়ন করতে পারে। এছাড়া ২০১৯ সালে বন্ধুদের নিয়ে তিনি তৈরি করেছিলেন (বশেমুরবিপ্রবি) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাব। সেখানে বাঁশ, কাঠ, ককশিট ও ফোমশিট ব্যবহার করে তৈরি করেন ড্রোন। ড্রোনের ওজন ছিল এক কেজি। সালাউদ্দিনের বিমান আকাশে উড়তে দেখে মুগ্ধ সকলেই। তার এই আবিষ্কার এলাকায় সৃষ্টি করেছে চাঞ্চল্য। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই তার এই উদ্ভাবন অসাধারণ।

এক আকাশে পাঁচটি সূর্য

বন্ধুরা, সূর্য তো একটাই হয় তাই না। তাহলে একটা আকাশে পাঁচটি সূর্য! এটা কী করে সম্ভব? বন্ধুরা, এই ঘটনাটি চীনের অভ্যন্তরীণ প্রদেশ মঙ্গোলিয়ার। সেখানকার আকাশে একসঙ্গে পাঁচটি সূর্যের প্রতিফলন জ্বলজ্বল করতে দেখা গিয়েছে। এ দৃশ্য দেখে কিন্তু অনেকেই ভৌতিক দৃশ্য ভেবেছেন। চীনের একটি সংবাদমাধ্যম ভিডিওটি শেয়ার করে। এক আকাশে পাঁচটি সূর্য ওঠার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে। বায়ুমণ্ডলে জমে থাকা শিশির কণাগুলো বরফে জমাট বেঁধে থাকায় সেগুলোতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়। আর সেই প্রতিফলনের ফলেই এই প্রাকৃতিক ঘটনাটি ঘটে। সূর্যের এই বিরল দৃশ্য শীতকালের হিমেল প্রবাহ ছাড়া দেখা যায় না। এক আকাশে পাঁচটি সূর্য ওঠার ঘটনা 'সূর্য সারমেয়' বা 'ভৌতিক সূর্য' নামে পরিচিত।

উসামা শব্দ আঁকেন

ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা কি জানো ক্যালিগ্রাফি কাকে বলে। ক্যালিগ্রাফি হলো সুন্দর হাতের লেখা অথবা চমৎকার লেখার একটা রূপ। এটি একটি শিল্প। সাধারণ হাতের লেখার চেয়ে আলাদা কিন্তু দৃষ্টিনন্দন আর আকর্ষনীয় হয় ক্যালিগ্রাফি। আমাদের দেশের উসামা হক ক্যালিগ্রাফি দিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন। উসামা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকেই ছবি আঁকতে পছন্দ করতেন। উসামার ক্যালিগ্রাফি শেখার শুরু তার বড়ো ভাই আহমদ রেজা ফারুকীর কাছ থেকে। এভাবে তার ক্যালিগ্রাফি শেখার যাত্রা শুরু হয়। ক্যালিগ্রাফি কিন্তু যে-কোনো ভাষায়ই হতে পারে। তবে কোরআনের আয়াতগুলোর ক্যালিগ্রাফি খুবই সুন্দর হয়। ১৫ বছর ধরে তিনি ক্যালিগ্রাফির কাজ করছেন। বিয়েতে নবদম্পতির নাম ক্যালিগ্রাফি করে উপহার দিতে চাইলে সেটাও করে দেন। এছাড়া বিজনেস কার্ডের কাজ, আরবি, বাংলার সাথে ইংরেজি ক্যালিগ্রাফির কাজও করছেন তিনি। উসামার অনেক কাজই এখন জনপ্রিয়। তিনি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন। সম্প্রতি ভিনদেশের এক প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত পর্বেও জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ চারুশিল্পী আয়োজিত প্রথম জাতীয় ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন উসামা। আসলে শখের কাজের প্রতি যদি ভালোবাসা ও যত্ন থাকে তাহলেই সফলতা পাওয়া যায়।

কবিরের কিতাবে ‘ক’

বাংলাদেশের কবিরের পুরো নাম সর্দার মো. নাজমুল কবির ইকবাল। ইকবাল নিজের নাম সংক্ষিপ্ত করে নিজেকে পরিচয় দেন ইসমোনাক বলে। ইসমোনাক নিজের মতো এক ব্যতিক্রমী সাহিত্যচর্চা করছেন। বাংলা ভাষার প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণ কোনটি বলো তো বন্ধুরা। হ্যাঁ ‘ক’। এই ‘ক’ নিয়েই ইসমোনাকের চর্চা। ২০ বছর ধরে তিনি এই সাহিত্যচর্চা করছেন। বিভিন্ন গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে তন্নতন্ন করে ‘ক’ বর্ণ দিয়ে শুরু প্রায় আড়াই লক্ষ শব্দ সংগ্রহ করেছেন তিনি। এ পর্যন্ত তার বই বেরিয়েছে তিনটি, সবই ‘ক’ দিয়ে রচিত। বইগুলো হলো কেষ্ট কবির কষ্টগুলো, কেষ্ট কবির কনফারেন্স ও কেষ্ট কবি। এই তিনটি বইয়ে ‘ক’ বর্ণ দিয়ে লিখেছেন প্রায় ২৭ হাজার শব্দ। ইসমোনাকের জন্ম ১৯৬৭ সালে, ব্রাহ্মনবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামের সরদার বাড়িতে।

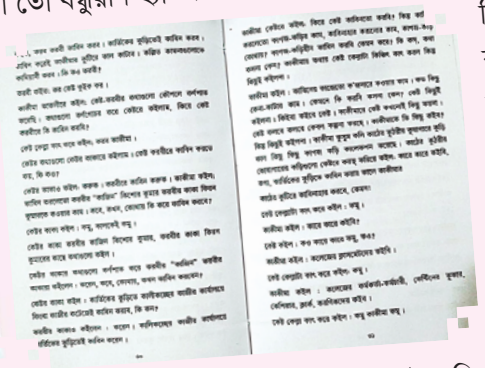

টেনিসে চ্যাম্পিয়ন সুস্মিতা

জান্নাতে রোজী

মুজিববর্ষ জাতীয় টেনিসের ফাইনালে মেয়েদের এককে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ঝালকাঠির মেয়ে সুস্মিতা। সম্প্রতি ঢাকা ক্লাবে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ৬-৪, ৬-৪ গেমে ঈশিতা আফরোজকে হারিয়ে সুস্মিতা এ জয় পান।

স্কুলে পড়ার সময় ব্যাডমিন্টন খেলতেন সুস্মিতা। তার ব্যাডমিন্টনের র‍্যালি, মুভমেন্ট আর স্ট্যামিনা দেখে টেনিস কোচ জাহাঙ্গীর আলম তাকে টেনিস খেলার পরামর্শ দেন। এরপর থেকেই অনুশীলন শুরু করে সুস্মিতা।

বিভিন্ন বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে ভালো করার সুবাদে গত তিন বছর জাতীয় দলে বেশ পরিচিতি পায় সুস্মিতা। খেলেছেন শ্রীলঙ্কা জুনিয়র ফেড কাপ, মালয়েশিয়া ফেড কাপ ও নেপালে দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে। সে পড়াশোনা করছে ঝালকাঠি মহিলা কলেজে।

ভারতের সর্বকনিষ্ঠ মেয়র

ভারতের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ মেয়র হিসেবে নাম লিখিয়েছেন ২১ বছর বয়সি আর্থ রাজেন্দ্রন। কেরালার রাজধানী তিরুঅনন্তপুরম পৌরসভার মেয়র হতে যাচ্ছেন তিনি। সম্প্রতি মুদাভানমুগল ওয়ার্ড থেকে পৌরসভা ভোটের বামপন্থি সিপিএম প্রার্থী হিসেবে প্রথমে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন রাজেন্দ্রন। আর রাজ্যের ক্ষমতাসীন সিপিএম রাজেন্দ্রনকে মেয়র হিসেবে বেছে নিয়েছে। ভারতের গণমাধ্যম এনডিটিভি ও হিন্দুস্থান টাইমের খবরে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

ভারতের কেরালার অল সেইন্ট কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আর্য রাজেন্দ্রন গণিত নিয়ে পড়াশোনা করছেন। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি যুক্ত আছেন বামপন্থি ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের রাজনীতিতে। পাশাপাশি তিনি সিপিআইএসের শিশু সংগঠন বাল্যসংঘের রাজ্যে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কেরালার রাজধানী শহরটির পুরনিগম আন্তর্জাতিক মহলে বেশ সুপরিচিত। পর্যটন ও বাণিজ্যের সুবাদে তিরুঅনন্তপুরম থেকে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত হয়। সেই পুরনিগমের মেয়র হিসেবে আর্যা রাজেন্দ্রন দায়িত্ব নেবেন।

তার বাবা বিমা কোম্পানিতে ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করেন। ■

শান্তমা খানম নিথী, ৫ম শ্রেণি, বোয়ালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বোয়ালী, গাজীপুর

নাজিলা মাহফুজ নাবিহা, ৫ম শ্রেণি, সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

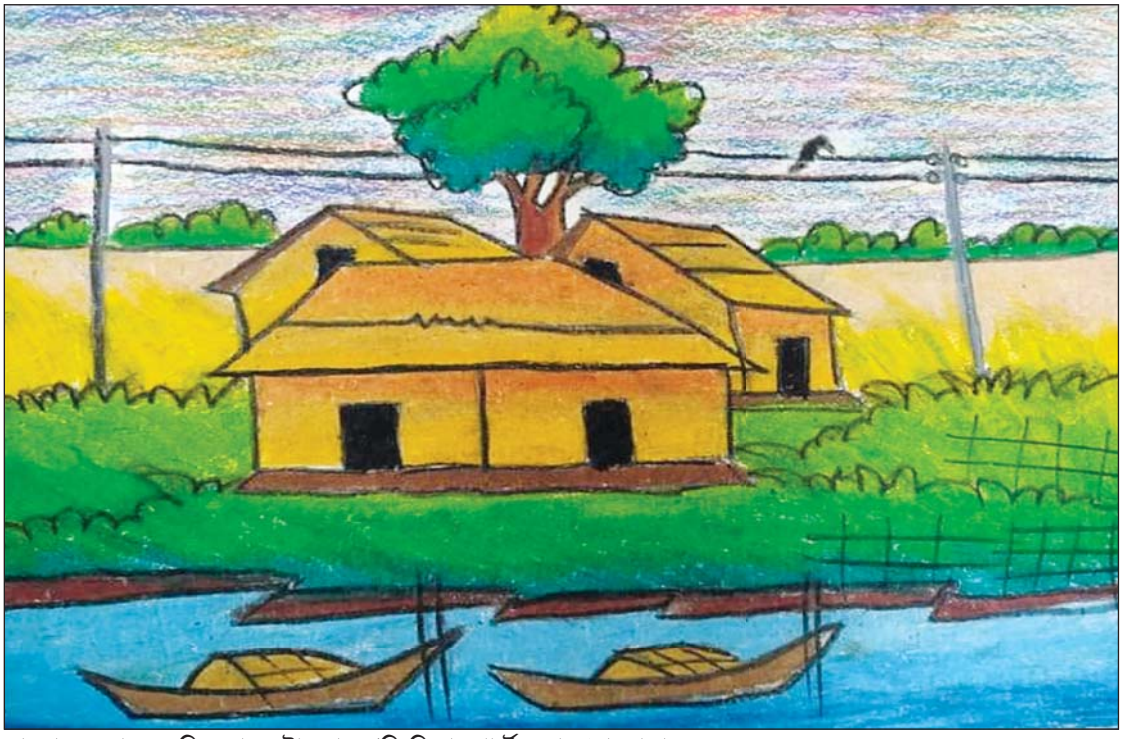

সাদমান রহমান, কেজি ওয়ান, স্টার হাতেখড়ি কিন্ডার গার্টেন, রামপুরা, ঢাকা

সোনালী দাস, ৪র্থ শ্রেণি, ৪নং গোয়াখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কালিবাড়ি, চাঁদপুর

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১.একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দাবি উত্থাপনকারীদের একজন, ৩. নারী, ৫.বিশেষ্য পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত পদ, ৭.সকল, ৯.তীর, ১০.গৃহ, ১১.সীমার শেষ

উপর-নিচ: ১.মাতৃভাষার দাবিতে একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ হওয়া একজন, ২. এক ধরনের পাখি, ৪. পৈশাচিক, ৫.ঘোড়ার রক্ষক, ৬.পোস্টমর্টেম শব্দের বাংলা শব্দ, ৮.ছোটো-এর বিপরীত, ১০.পাতলা-এর বিপরীত শব্দ

১.						২.	
৩.		৪.		৫.			৬.
				৭.	৮.		
৯.			১০.				
					১১.		

ছক মিলাও

শব্দধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: লব, শব, চিলেকোঠার সেপাই, সরবরাহ, কোয়েল, সহজ, আপাতত, ললাট, কলা

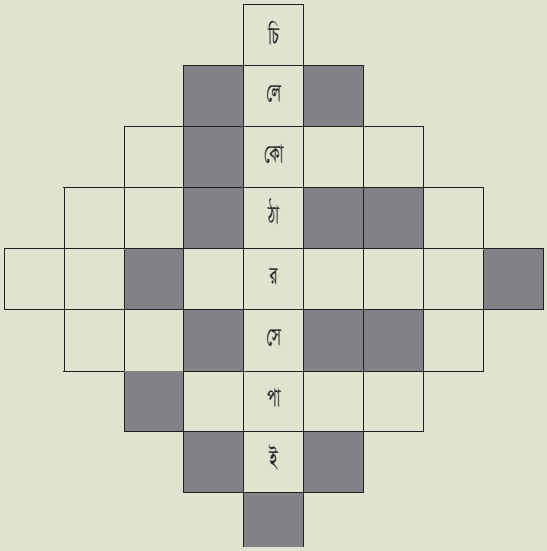

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৪	+		-	৭	=	
/		/		*		+
	*	৩	*		=	৬
+		+		-		-
৫	+		-	২	=	
=		=		=		=
	+	৩	-		=	৫

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৭	৬	১	৪৬	৪৭	৫০	৫১	৭৬	৭৫
৮	৫	২	৪৫	৪৮	৪৯	৫২	৭৭	৭৪
৯	৪	৩	৪৪	৪৩	৫৪	৫৩	৭৮	৭৩
১০	১৫	১৬	১৭	৪২	৫৫	৫৬	৭৯	৭২
১১	১৪	১৯	১৮	৪১	৪০	৫৭	৮০	৭১
১২	১৩	২০	৩৫	৩৬	৩৯	৫৮	৮১	৭০
২৩	২২	২১	৩৪	৩৭	৩৮	৫৯	৬৮	৬৯
২৪	২৭	২৮	৩৩	৩২	৬১	৬০	৬৭	৬৬
২৫	২৬	২৯	৩০	৩১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫

মুজিববর্ষের ঘোষণা

বন্ধুরা, তোমাদের জন্য সুখবর। নবারুণের 'বুদ্ধিতে ধার দাও' এতদিন খেলে উত্তর পাঠিয়েছ কিন্তু কোনো উপহার পাওনি। এপ্রিল ২০২০ সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছে উপহারের পালা। সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ীকে দেওয়া হবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকার প্রাইজবন্ড। এজন্য নবারুণ পত্রিকার পাতা (ফটোকপি প্রযোজ্য নয়) পূরণ করে বন্ধ খামে পাঠাতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই লিখতে হবে 'বুদ্ধিতে ধার দাও'। পাঠাবে এই ঠিকানায়—

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

বুদ্ধিতে ধার দাও

জানুয়ারি ২০২১ -এর সমাধান

শব্দধাঁধা

ফ	রি	দ	পু	র		শ	
রা				সা	গ	র	
সি	পা	হী		ল		ব	
	রা				গ	ত	র
অ	ব	য়	ব				
	ত		ক	ল	স		
			ল				
		আ	ম	র	ণ		

ছক মিলাও

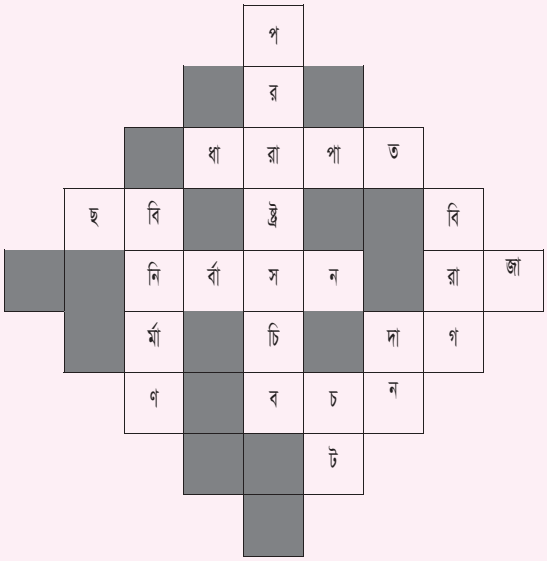

ব্রেইনইকুয়েশন

৩	*	৪	-	৫	=	৭
+		+		+		+
৬	*	২	-	৩	=	৯
-		-		-		-
৭	+	৫	-	৪	=	৮
=		=		=		=
২	*	১	*	৪	=	৮

নাম্ব্রিক্স

৭৯	৭৮	৬৩	৬২	৬১	৬০	৪৫	৪৪	৪৩
৮০	৭৭	৬৪	৬৫	৫৮	৫৯	৪৬	৪৭	৪২
৮১	৭৬	৭৫	৬৬	৫৭	৫৪	৫৩	৪৮	৪১
৭২	৭৩	৭৪	৬৭	৫৬	৫৫	৫২	৪৯	৪০
৭১	৭০	৬৯	৬৮	৩৩	৩৪	৫১	৫০	৩৯
১০	১১	১২	১৩	৩২	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮
৯	৮	১	১৪	৩১	৩০	২৯	২৬	২৫
৬	৭	২	১৫	১৮	১৯	২৮	২৭	২৪
৫	৪	৩	১৬	১৭	২০	২১	২২	২৩